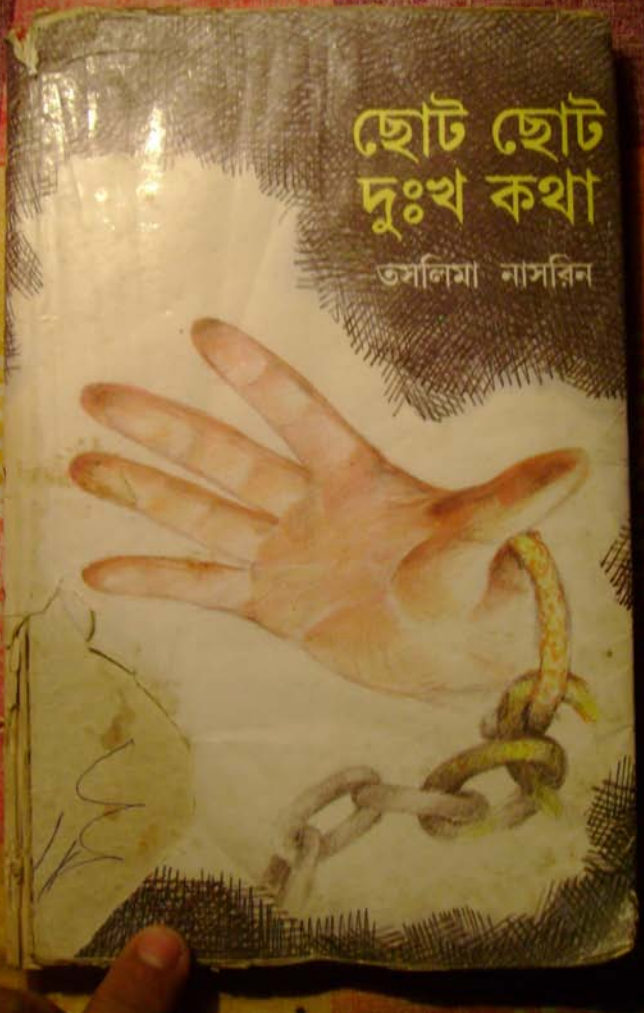
ছোট ছোট
দুঃখ কথা
তসলিমা নাসরিন

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

ছোট ছোট দুঃখ কথা

তসলিমা নাসরিন
([redacted])

কাকলী প্রকাশনী

©
তসলিমা নাসরিন

প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে ফেব্রুয়ারী '৯৪ বইমেলা উপলক্ষে
প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার
এ কে নাছির আহমেদ সেলিম কর্তৃক কাকলী প্রকাশনী ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০ থেকে প্রকাশিত চন্দ্রিকা কম্পিউটার্স ১৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০ থেকে কম্পোজ এস আর প্রিন্টিং প্রেস ৭ শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেন ঢাকা ১১০০ থেকে মুদ্রিত।

দাম ৬০ টাকা

ISBN 984 437 044 2

শওকত ওসমান
আহমদ শরীফ ও
কবীর চৌধুরীকে
শ্রদ্ধা জানাই

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই

নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য

যাবো না কেন? যাবো

ভ্রমর কইও গিয়া

সম্পাদনা

ফ্যান দাও

আপনার কি মা বোন নেই?

প্রায়ই রাস্তা ঘাটে বাসে ট্রেনে ছেলেরা যখন মেয়েদের প্রতি অশোভন আচরণ করে, তখন মেয়েদের পক্ষ নিতে কিছু লোক জড়ো হয়। সাধারণত এরা ছেলেদের গালাগাল করে এবং সদুপদেশ বিতরণ করে। এরা ছেলেদের তিরস্কার করতে গিয়ে বলে 'আপনার কি মা বোন নেই?' আমি অনেকদিন ভেবেছি এমন অবস্থায় বিবেকবান মানুষেরা মা বোনের প্রসঙ্গ তোলেন কেন? পুরুষেরা নারীকে অত্যাচার করছে, এতে মা বোনের সম্পর্ক উল্লেখ করা জরুরী কেন তা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। কেবল রাস্তাঘাটের উপদেষ্টা পুরুষ নয় এমন কথা আমাদের নামকরা লেখকও বলেন যে নারীকে মাতৃরূপে কন্যারূপে এবং ভগ্নীরূপে দেখতে হবে। আমার প্রশ্ন —নারীকে মা, বোন কন্যা হিসেবে দেখতে হবে কেন? এগুলো একধরনের সম্পর্ক। নারীকে সম্মান করতে হলে কোনও এক সম্পর্কের বাউন্ডারির মধ্যে এসে সম্মান করতে হবে কেন? যে পুরুষের মা বোন নেই, সে পুরুষের কাছে তবে কি নারীরা সম্মান পাবার অধিকার রাখে না? নারীকে কেন পুরুষের মা বোন এবং কন্যা রূপে বিরাজ করে নিজের সুবিধা আদায় করতে হবে? নারী আপাদমস্তক মানুষ, এই মর্যাদা পাওয়ার যোগ্যতা নিশ্চয়ই সে রাখে। বলা হচ্ছে পুরুষ তাকে অমর্যাদা করবে না কারণ পুরুষের মা এবং বোন সম্পর্কটি যেহেতু নারীরা বহন করে, তাই কোনও নারী ওই সম্পর্ক বহন না করলেও অন্তত পুরুষের স্মরণ করতে হবে তার আত্মীয়দের মতোই দেখতে নারীকে নির্যাতন করা বা অসম্মান করা যাবে না অথবা তাকে করুণা করতে হবে। মা ও বোনকে সাধারণত করুণাই করে পুরুষরা। এই করুণা যেন পুরুষেরা নারীকে করে—এই হল মূল কথা। এ ক্ষেত্রে আগের কথাটিই আসে কোনও পুরুষের যদি মা এবং বোন না থাকে, তবে কি সে নারীকে অপমান করবার অধিকার রাখে? 'আপনার কি মা বোন নেই?' এর উত্তরে কোনও পুরুষ যদি বলে বসে—'না নেই,' তবে? তার অপরাধ কি তখন ক্ষমার যোগ্য?

একবার এক ছেলে রাস্তায় এক মেয়ের ওড়না টেনে নিয়ে ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছিল। লোক জমা হল। অনেকে জিজ্ঞাসা করল—'আপনার কি মা বোন নেই?' ছেলেটি উত্তর দিয়েছিল—'মা বোন আছে, তবে বউ নেই।' ছেলেটি কিন্তু মস্ত বলেনি। যদি সম্পর্ক দিয়েই বিচার করা হবে তাবৎ নারীকে, তবে বধূরূপে কেন নয়? মা-বোন এবং কন্যার মত বধূও তো একধরনের সম্পর্ক। রূপের কথাই যদি ধরা হয়, তবে এও তো প্রশ্ন যে সব 'রূপ' নয় কেন? পুরুষেরা কোনও নারীর মধ্যে মাতৃরূপ দেখবে, কোনও নারীতে পাবে ভগ্নীরূপ, কোনও নারীতে আবার বধূরূপ। বধূরূপে যাকে মনে হবে, তাকে রাস্তাঘাটে যেমন যখন তখন পেটে পিঠে গুঁতো দেওয়া যায় তেমন দেবে। বধূকে যেমন যখন ইচ্ছে আদর সোহাগ করা যায়, তেমন করবে।

পুরুষেরা মা বোন কন্যা রূপে পরিচিত হয়ে সম্মান পাওয়া নারীর জন্য অপমানকর। কোনও সম্পর্করূপে নয়, নিজের পরিচয়ই এখন আসল পরিচয় হওয়া উচিত নারীর জন্য। সম্পর্কের

দেখাই দিয়ে নারীকে সমান দেয়ে হয়ে কেন? নারী কি মানুষ হিসেবে সমান পাওয়ার দাবী হয়ে যা

'মেয়েরা তো মায়ের জাত।'—এরকম একটি কথাও প্রায়ই শোনা যায়। মেয়েদের সম্মান করতে হবে কারণ তারা মা। এখানে ঠিক সম্মান করবার কথাও বোঝানো হয় না, 'মেয়েরা মাই' করে হাসে ওরা' ধরনের শব্দিকটা কিন্তু না, মেয়েদের মায়েদের না করলেও তো পাওয়া-যাওয়াটি এরকম। এখানে মা বলে যে গৌরব করা হয়েছে, তা অনুসন্ধান করি মেয়েও কখনো মায়ের গৌরব পায়, সেটা মেয়েদের অন্যের কথা জানা হয়েছে। সেটা মেয়েদের জন্য নিয়ে মেয়েরা মায়ে কাজ করে, তাই মেয়েদের প্রকৃতপক্ষে ছুঁয়ে না মেয়েদেও তো মায়ে...মেয়েদের মায়ের আর কখনো পেয়ে যে টোনটা কাজ করে তা এরকমই।

মেয়েদের সম্মান করবার জন্য নানারকম যুক্তি টানা হয়, কিন্তু পুরুষকে সম্মান করবার জন্য কোনও যুক্তি টানবার দরকার পড়ে না, সম্মানকে প্রকৃত একটা বাজনা নিতে হয় না যে এরা বাজার জার, এদের হাত ভাই-এর মত দেখতে হবে ইত্যাদি। এসব যুক্তির প্রয়োজন হয় না বলে মেয়েরা কেনও যুক্তি এরা ইত্যাদিরা ছাড়াই পুরুষকে সম্মান করে, সেহেতু পুরুষেরা 'মানুষ' পুরুষকে তারা মানুষের মর্যাদাটুকু দেয়।

নারী মানুষের মর্যাদা পাবে, সে তার নিজের অধিকারেই। পুরুষেরা যা কোন সম্পর্কের কারণে না। সেই সম্পর্কের কারণমুক্তকেও না।

তবুও বহু বহু বৃদ্ধিজীবীও নারীকে যা এরা দেখাবেন দেখাবে। তাঁরা বলি, সম্পর্কের কথা কেন নারীকে করতে হবে? সে কি কারও মা এরা বোন না হয়েও কেবল মানুষ হয়ে মানুষের শব্দিয়ে সম্মান পাবার যোগ্যতা রাখে না? আমরা সবাই তাঁদে নারীর এই অধিকার রাখে। যারা তার এই অধিকার বর্ণ করতে চায় তারা কেবল দেখাপড়া না জানা মানুষই নয়, দেখাপড়া জানা মানুষও।

প্রতিষ্ঠানশিক্ষিত মেয়েও তার প্রাতিষ্ঠানিকতার কাঠামোর নারীকে সম্মান করতে হবে দেখি। বুর্ণ পুরুষের চেয়ে বর্ণ পুরুষ মেয়েও সম্মানের থাকতে হবে। তাঁরাও এরা নিজে নিজে নারীকে বিচ্ছিন্ন মা বলে বোনের দেখাদে মানুষ করে দেখে, এইসব সামাজিক সম্পর্কের বাইরে তার পরিচয় স্বীকার করে না। মেয়েটির বুদ্ধিটি, কেবল গোটাকয় সম্পর্কের খাঁচায় মেয়ে নারীকে আটকে রাখে রাখা হয়। কারণ পুঁথি পুড়ির মত সমস্ত পুরুষ মত নারীকে মা বোন বলে ইতাদি পড়ে দেখা যায়, এরে নারী মানুষ আটকে গেলো নাম আকার হয়ে কেবল সামাজিক ভাবনায় পেয়ে।

পুরুষ নারী মানুষ...এই ভেদ নারীর প্রথম এবং শেষ পরিচয়।

রাত বার দিন, ঢাকা

১.

আজকাল রাস্তায় মেয়েরা পরিচয় দিতে বলছে। কেবল নিজ হিসেবেই নয়, পুরুষী—এমন কি প্রেমিকও বলছে। জীবনের জন্য পরিচয় বহন করে মেয়েদের শরীর জন্য এক ইঁদুর খাচে। আমি এমন ইঁদুর মেয়েকে জানে যুক্ত না পরিচয় নিয়ে সাংবাদপত্রের নিজে ছুটে আসে মেয়েদের মাতাও। তারা পরনে হয়ত কম পাকে, নানাভাবে নানা রকম কাজ ইত্যাদে আসে। অথচ অন্যটি থেকে তারা মুক্ত নয় কিছু সে আইনজীবন ডাক্তারে আসে, যা করুন মেয়েরা জন্যেও। আমি দেখিছ আন মেয়েরা চোখে মেয়েটি দেখে দুটি। এরা শব্দিকর্মে হয়ে যায়, অনেক অনেক ভয় অবর অবলম্বন অন্যায় হয়ে যায়; আসলে এরা ঠিক হয় না, এদের নিয়ে চাওয়াদের হয়। কথায় কথে কাঁটা নিয়ে কাঁটা তুলতে হয়। পুরুষদেরি সমাজের দেখেকো নারীদের 'অন্যরকম' নিয়ে মেয়ে শক্তি পাবনা নিয়ে, দেখাবার রমুদের সাদের নিয়ে, সমান নিয়ে, হার মেয়াদের এই নিয়ে মেশের শিক্ষিত মেয়েরা অধিকাংশই এমন বুঝে নিয়ে অপরের ভিন্নিয়ে পিঠি হয়ে যায়।

২.

ঢাকা শহরে একজন মাজিস্ট্রেটকে খুন করা হয়েছে। কারণ সে নিয়োকর জমী খান নামের এক মাজিস্ট্রেটকে নিয়ে করতে অধীকার করেছিল। মাজিস্ট্রেট শব্দিনাদে মরে মেয়ে তার তাই নিয়োকরের হাতে। নিয়ে না করাতে চাওয়ার জন্য হল এই। আসলে নিয়ে না করাতে চাওয়ার নয়, পুরুষের আসেশ না মানার জন্য এই। অনুমান করতি নিয়োকরের সাথে শব্দিনার বন্ধুত্ব বা প্রেম বা প্রেম কিছু ছিল। তাই নিয়োকর প্রেম খাঁচিয়ে। পুরুষেরা যে মেয়েও সম্পর্কের অনুভূতির মেয়েদের ওপর প্রেম খাটায়। সে পিতা প্রেম, ভাই প্রেম, বন্ধু প্রেম, স্বামী প্রেম, পুত্র প্রেম। এরা মেয়েই নিয়েছে মেয়েরা ওদের আসেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। কেউ যদি পালন না করে, বরা হবে কন্যা অবাধ্য হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ—পিতা ভক্ষন ভাকে, মেয়ে যদি প্রাপ্তবয়স্কাও হয়, তারে বেঁধে নিয়ে নিজে মেয়ে অবাধ্য অবলম্বি করে, পুত্র অবাধ্য হলে কিন্তু তাকে নিয়ে মেয়েরা হয় না, কেবল পরোক্ষেও হয় না বরা অবাধ্যতার ও উপস্থিত সমাজে অবাধ্য পুরুষকে নিজেন পরিবে দেখেরা হয়, অর্থাৎ অবাধ্য পুরুষ অধিকার ছাড়া কথা—তাকে প্রতিষ্ঠিত অবলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যেখানে কন্যাকে পরিবর্তনের বাধানো হয় জাতি সর্বনাশ করা হয়। অবশ্য অবাধ্য না হলেও মেয়েদের সর্বনাশ অবলম্বে জন্য অভিভাবকরা সব সময় প্রস্তুত থাকেন। অবাধ্যের কোনও তড়িঘড়ি করেন এই যা।

ভাইরা ভোক্ত পাইয়ে মেশেদের ওপর। সংসারে ভাইদের ভুরু কথাগুলি পাইবার বাড়িতে মেয়েদের ওপরই পড়ে। নিজে না খেয়ে ভাইয়ের জন্য রেখে দেওয়া, ভাইকে বড় মাছ বড় মাংস পাইয়ে নিজে সামান্য কিছু মুখে দেওয়ার 'কালচার' অভিভাবকরাই শিখিয়ে দেন। তার ওপর শিক্ষার জন্য ভিতের মেয়েদের ভাগে যেটুকু ছিটেফোঁটা পড়ে তা ভোগ করবার সময় পর্যন্ত নিজে ভোগেদের ভুক্তি নেই। ভাইদে ভোগের কথা বলবার মনে হয় প্রয়োজন নেই। আমার বিশ্বাস ভাইটি বিবাহিত মেয়েই আনে কার অপুনি নির্দেশে আসে চলতে হয়, অন

হয়ে বধির হয়ে পঙ্গু অথর্ব হয়ে বেঁচে থাকতে হয় কার আক্রোশে। দু একটি ব্যতিক্রম অবশ্য আছে, কিন্তু ব্যতিক্রম কখনও উদাহরণ নয়। এই যখন সমাজের অবস্থা, তখন বন্ধু বা প্রেমিকেরা সম্পর্কের ছুতোয় জোর খাটাবে কেন? নিয়াকত জেনেই নিয়েছে সে পুরুষ, সে যা বলবে শাহিনাকে তা-ই শুনতে হবে। শাহিনা শোনেনি, সম্ভবত শোনেনি এই জন্য যে সে একজন শিক্ষিত স্বনির্ভর মেয়ে, তার নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছের দাম সে দিতে চায় কিন্তু তা মানবে কেন নিয়াকত, সে পুরুষ—সে তার গায়ের জোর তার ছুরির জোর তার পুরুষত্বের জোর না খাটালে সে আর পুরুষ কেন? পুরুষ এমনই জন্তু বিশেষ যে দাঁত নখ চোখের হিংস্রতা দিয়ে সে তার পুরুষত্ব জাহির করতে চায়। মনুষ্যত্ব, আমি সবসময় দেখেছি পুরুষের মধ্যে খুব কম। মনুষ্যত্বের সঙ্গে পুরুষত্বের বোধহয় চিরকালীন এক বিরোধ আছেই। নিয়াকত যদি বিয়ে করত শাহিনাকে, একরকম আঘাতে আঘাতে শাহিনাকে তিল তিল করে মরতেই হত, কেউ দেখতে পেত না তার ভেতরের রক্তক্ষরণ, লোকে ভাবত—কী চমৎকার জুটি! লোকে এখনও চোখে কালি পড়া নিরন্তর মার খাওয়া স্ত্রীদের নির্দ্বিধায় সুখী বলে বিবেচনা করে। নিয়াকত পুরুষের মত পুরুষ। সে পুরুষের যোগ্য কাজই করেছে। নারীকে ইচ্ছা মতন হত্যা করেছে।

মুনিরের ফাঁসি হলে নাকি পুরুষের শিক্ষা হবে। নিয়াকতের কি আদৌ কোনও শিক্ষা হয়েছে? হয়নি। আসলে কোনও পুরুষেরই, আমার বিশ্বাস, কখনও শিক্ষা হবে না। তারা সুযোগ পেলেই মেয়েদের গলায় ছুরি বসাবে। ফাঁসি কেন, এদের ন্যাংটো করে গলায় দড়ি বেঁধে সারা রাস্তায় ঘোরানো উচিত। যেন হাজার মানুষ দেখে এদের পরিণতি, যেন শেয়াল শকুনে খায় এদের পচা মাংস। ফাঁসিতে ঝোলানো তো একরকম বেঁচে যাওয়া। দু'একজন ছাড়া কেউ দেখল না, বুঝল না, নিয়াকতের মত বদমাশের কলজেও সামান্য কাঁপল না। ফাঁসিতে হবে না, জঘন্য মানুষের জন্য জঘন্য শাস্তির ব্যবস্থা হোক। এই শাস্তির পক্ষে যেন আন্দোলন করতে না হয়, কোর্টের দরজায় গিয়ে স্লোগান দিতে না হয়। কজন অত্যাচারির জন্য মহিলা পরিষদকে চেঁচাতে হবে? দেশের আনাচে কানাচে সর্বত্র অত্যাচার করছে এরা। অত্যাচারির সংখ্যা কি আঙুলের কড়ায় গুণে শেষ হয়? খুনি পুরুষ কি কেবল ইকবাল, মুনির আর নিয়াকতই? আফজাল, শফিক, রিয়াজউদ্দিন, সিরাজ, খোকা, জুলমত কি খুন করছে না? খুঁজে দেখুন, করছে।

বাসাবোতে নিলুফার নামে এক মেয়েকে খুন করেছে তার স্বামী। সেই স্বামী এখন বহাল তবিয়তে আছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে কে আটকায়। তার আছে পয়সার জোর, সবচেয়ে বেশি আছে সরকারের জোর। সরকারের জোর যার আছে সে যত বড় চোর ডাকাত বদমাশ খুনি হোক, পার পেয়ে যায়। সরকার তার পোষা বদমাশদের জন্য বড় আদর করে একটি সাঁকো বানিয়েছেন। আল্লাহতালার পুলসেরাতের চেয়ে সরকারের সাঁকো বেশী মজবুত।

যায় যায় দিন, ঢাকা

মুনির, খুকু এবং অন্যান্য

১.

মুনিরের ফাঁসি হবে। নারী নির্যাতনের খুব বিচার হয় এদেশে— মুনিরের ফাঁসির ব্যবস্থা দেখে অনেকে এরকম ধারণা করতে পারেন কিন্তু আসলেই কি সারাদেশে নারীরা এরকম বিচার পাচ্ছে? চাপে পড়ে সরকার বা সরকারি বিচারক এ ধরনের বিচারে অগ্রসর হয়েছে, পত্রপত্রিকার চাপ না থাকলে আমার বিশ্বাস মুনির আজ প্রকাশ্য রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, লোকে তার সঙ্গে হেসে কথা বলত, কেউ কেউ সালাম ঠুকত, বহাল তবিয়তে সে বাণিজ্য করত, শপিং করত, কেউ তাকে মন্দ বলত না। দেশে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে খুনি বদমাশেরা, আমরা তাদের চিনি কিন্তু বিচার করি না। দেশে অসংখ্য মুনির হাসছে খেলছে, তাদের আমরা চিনি না তা কিন্তু নয়।

খুকুকে নিয়ে পত্রিকায় প্রচুর বাজে কথা লেখা হয়েছে। খুকুকে ছিছি করেছে মানুষ। কিন্তু খুকুর কি কোনও দোষ ছিল? সে প্রেমে পড়তেই পারে মুনিরের, প্রেমে পড়া দোষের কিছু নয়, বলা হয়েছে খুকুর বয়স বেশি, খুকুর স্বামী সংসার আছে — সে কেন প্রেমে পড়বে? এ কি কোনও যুক্তি? প্রেমে পড়বার কোনও নির্দিষ্ট বয়স আছে নাকি? যদি থাকে বয়সের এই সীমানাই বা রচিত করেছে কে? আমি লজ্জায় মুখ ঢেকেছিলাম সেদিন, যেদিন মহিলা পরিষদের সদস্যারা কোর্টের গেটে দাঁড়িয়ে খুকুর ফাঁসি দাবি করেছিল। অক্ষম অথর্ব স্বামী যার, স্বামী যাকে বঞ্চিত করেছেই কেবল, সে যদি কারও সঙ্গে প্রেম করে, এবং প্রেমিকের সঙ্গে তার শারীরিক মানসিক সম্পর্ক স্থাপন হয়— তবে কার কী বলবার আছে? আর কারও সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যে স্বামীকে অক্ষম হতে হবে তাও আমি মানি না। খুব সক্ষম স্বামী রেখেও যে কোনও নারী তার ইচ্ছে যদি প্রেমে পড়বার, পড়তে পারে। সমাজ কেন মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা ঠেকিয়ে রাখবে? ভালবাসা ঠেকাবার দায়িত্ব সমাজকে দিয়েছে কে? খুকুর সঙ্গে মুনিরের সম্পর্ক নিয়ে দেশের মানুষ কেন চিৎকার করেছিল আমি বুঝি না। মুনির মেরেছে তার স্ত্রীকে, শাস্তি হবে মুনিরের। এতে খুকুর কী? খুকুর সঙ্গে মুনিরের সম্পর্ক ছিল, থাকতেই পারে, এটি খুকুর দোষ নয়, মুনির তার স্ত্রীর সঙ্গে প্রতারণা করেছে, কারণ সে খুকুর সঙ্গে ভালবাসা ভালবাসা খেলেছে কিন্তু বিয়ে করেনি। পুরো ঘটনায় সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছে খুকু। সারাদেশ তার ভালবাসা নিয়ে গালাগাল করল, তাকে জেলে ভরল, 'খুকু' নামটিকে একটি নষ্ট মেয়ের নাম হিসেবে চিহ্নিত করল, মোট কথা খুকুকে হেনস্থা করল সকলে, ভালবেসে কি দোষ করেছে খুকু? ভালবাসা কি এই দেশে দোষের জিনিস?

মুনিরের ফাঁসি হবে ভাল কথা। এই দেশে তাহলে হত্যার বিচার হয়! এই দেশে তবে নারী নির্যাতনের এমনই সুবিচার! আমরা কি আর রাস্তাঘাটে দেখতে পাবো না হত্যাকারীদের মুখ? এ দেশ কি মুক্ত হবে শঠ শয়তান থেকে? এদেশে কি আর গজাবে না কোনও ধূর্ত বদমাশ? খুনি? আমরা খুব ভাল করেই আমি খুনিদেরই রাজত্ব এখন। খুনিরাই গদিতে, খুনিরাই মাথার ওপর, খুনিদের হাতেই সর্বময় কর্তৃত্ব এখন।

২

ধর্মের কারণে এ যাবৎ কত মানুষ মরেছে পৃথিবীতে, তা হিসেব করবার সাধ্য কারও নেই জানি। মানুষের জন্য ধর্ম, নাকি ধর্মের জন্য মানুষ— এই প্রশ্নের কোনও জবাব দেয়নি ধর্মবাদিরা। আমরা বিশ্বাস করতে চাই মানুষের জন্য ধর্ম। কিন্তু সারাদেশের ধর্মবাদিরা বলতে চায় ধর্মের জন্য মানুষ। যেহেতু ধর্ম আবিষ্কার হয়েছিল একদা, তাই ধর্মের জন্যই বিসর্জন দিতে হবে জীবন, ধর্মের জন্যই অবাধে অধর্ম করতে হবে।

তুরস্ক দূরের একটি দেশ। দূরের সেই দেশে কিছুদিন আগে কী মর্মান্তিক একটি কাণ্ড ঘটে গেল। তুরস্কের সিবাস শহরের এক হোটেলে কবি লেখকরা যখন নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মগ্ন তখন ক্রুদ্ধ জনতা হোটেলটি ঘিরে ফেলে এবং হোটেলটিতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আগুন জ্বালাবার কারণ এই সভায় আজিজ নেসিন নামের একজন লেখক ছিলেন, আজিজ নেসিনের অপরাধ তিনি ধর্ম মানতেন না এবং সালমান রুশদির বইয়ের অংশবিশেষ অনুবাদ করেছেন। আজিজ ধর্ম মানতেন না একটি একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। 'ধর্ম পালনের অধিকার যদি কোনও ব্যক্তির থাকে, ধর্ম পালন না করবার অধিকারও তেমনি তার থাকে। আস্তিক হবার অধিকার যেমনি তার থাকে। আস্তিক হবার অধিকার থাকলে নাস্তিক হবার অধিকারও থাকে। ধর্মপ্রচারের অধিকার যদি থাকে, ধর্মবিরোধিতার অধিকারও তাহলে থাকে বিদ্যমান।' আজিজ নেসিনের অপরাধ আদালতে প্রমাণ হল না, কোনও রায় ঘোষিত হল না তাঁর বিরুদ্ধে, কিন্তু কিছু ধর্মোন্মাদ ব্যক্তি তাঁর বিচার করবার নামে হোটেলটি পুড়িয়ে দিল। হোটেলে আগুন লাগবার কারণে চল্লিশজন মানুষ মারা যায় আর আহত হয় দেড়শ জন। যারা আহত এবং নিহত হল তারা কী অন্যায় করেছে যে মরতে হবে? একটি হোটেল—তাতে কতরকম লোক থাকে। এতে আগুন লাগিয়ে নিরীহ কিছু প্রাণীকে যে নির্বিচারে মেরে ফেলা হল তার দায় কে নেবে? ধর্মের নামে তুরস্কে যা হয়ে গেল এতে কি তুরস্কের মান বাড়ল? ধর্মের নামে যদি কেউ হোটেল জ্বালিয়ে দেয়, মানুষ হত্যা করে, জবাই করে, নলি কেটে দেয়, তবে কি ধর্মের গৌরব কিছু বাড়ে? আমার তো মনে হয় কমে। ধর্ম কি সহনশীলতার কথা বলেনি? ধর্মবাদিরা তবে শান্ত সৌম্য স্থির নিষ্কম্প্র নয় কেন? কেন তাদের এত জ্বালাও-পোড়াও ধ্বনি? কেন তাদের 'খুন কর খতম কর'র জল্লাদি আহ্বান? ধর্মের নামে সারা পৃথিবীতে ধ্বংস আর রক্তপাত চলছে—এই রক্তপাত রোধ করবার জন্য আজ বোধসম্পন্ন যে কোনও মানুষেরই সজাগ হওয়া প্রয়োজন। কারণ চোখ বুজে থাকলে এদেশও যে কোনও একদিন তুরস্কের হোটেলে পরিণত হবে, যে কোনও একদিন অবিবেচক নির্বোধ লোকেরা ধর্মের নামে পুড়িয়ে দেবে পুরো দেশ।। তখন কি আমরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেও রক্ষা পাব?

যায় যায় দিন, ঢাকা

৮ জুলাই একটি জাতীয় দৈনিকের প্রথম পাতায় পটুয়াখালীর এক লঞ্চযাত্রীকে ধর্ষণের খবর ছাপা হয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার লঞ্চযাত্রীটিকে ডাকাতেরা নয়, লঞ্চের মাস্তান ছেলেরা নয়, মদ্যপ বদমাশরা নয়, ধর্ষণ করেছে ওই লঞ্চে যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য যে আনসার রাখা হয়েছিল, তারা। তারা মোসাম্মত বেগম নামের কুড়ি বছর বয়সের এক যাত্রীকে তাদের কেবিনে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। সংখ্যায় তারা পাঁচজন ছিল। পাঁচজন আনসার একটি মেয়েকে অবলীলায় ধর্ষণ করল। লঞ্চ ভর্তি লোক, তারা একটুকু বিব্রত হয়নি। সেবকদের পুরুষাঙ্গ লঞ্চের ভিড়ের মধ্যে একটি যাত্রীর জন্য উত্থিত হয়েছে। উত্থিত হওয়ায় আমি কোনও আপত্তি করছি না। তারা সেবক হলেও পুরুষ তো, উত্থিত হবেই। মেয়েটি যদি তাদের উত্থানে সাড়া দিত, যদি এমন হত যে পাঁচজনের সঙ্গে সঙ্গমে মোসাম্মত বেগমের আপত্তি নেই তবে এ নিয়ে সারাদেশের কারও আপত্তি করবার প্রশ্ন ওঠে না। মানুষের স্বাধীনতা আছেই যে কোনও সম্পর্কের গভীরে যাওয়া, অবশ্য পরস্পরের যদি আপত্তি না থাকে। কিন্তু জোর করে কোনও সম্পর্ক স্থাপন হতে পারে না। হওয়া উচিত নয় যদি এই সমাজ সভ্য হয়, সভ্য বলেই তো দাবি করছে সবাই, তবে জোর করে সম্পর্ক সম্ভব হয় কী করে? কী করে একজন যাত্রীকে ধর্ষণের জন্য এই সেদিন রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত আনসারেরা, যে আনসার শব্দের অর্থ 'স্বেচ্ছাসেবক', তারা উন্মত্ত হয়? কী করে যাত্রীদের সেবকরাই যাত্রীদের নিরাপত্তার সবচেয়ে অন্তরায় হয়?

ধর্ষণ করেও আমাদের সেবকেরা ধর্ষণের অপরাধে দণ্ড পেতে রাজি নয়, তাই যখন খবরটি আনসার এডজুটেন্টকে জানানো হয়, তিনি পাঁচজন 'সেবক ধর্ষক' কে সাসপেণ্ড করেন, কিন্তু সাসপেণ্ড করা তো শেষ কথা নয়, ধর্ষণের মামলা হতে হবে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, ধর্ষিতা মেয়েটিসহ আনসারদের যখন এডজুটেন্ট অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়, আনসারেরা জোর করে যেমন ধর্ষণ করেছিল, জোর করে সরিয়ে দেয় ধর্ষিতা মেয়েটিকে। যেহেতু ধর্ষিতাকে হাতের কাছে পাওয়া যায় নি তাই আমাদের পুলিশ সাহেবেরা মামলাটি নাকি নিতে পারেন নি। অর্থাৎ ধর্ষণের কোনও মামলা হয় নি। এই ধর্ষণের খবর লঞ্চ যাত্রীরা জানেন, লঞ্চ মালিক জানেন, সারেং জানে, আনসার এডজুটেন্টও জানেন যে কারণে তাদের সাসপেণ্ডও করেছেন তিনি, তবে পুলিশের জন্য কেন ধর্ষিতা মেয়েটিকে দরকার? মেয়েটি তো যাচ্ছিলই পুলিশ অফিসে, মেয়েটিকে সরিয়ে দেওয়া হল কেন? মামলা তো এখন ওদের বিরুদ্ধে দুটি হওয়া দরকার, ধর্ষণ এবং অপসারণ। তারা ধর্ষণও করবে, ধর্ষিতাকে কায়দা মত গায়েব করবে, আর তাদের বিরুদ্ধে কোনও মামলা হবে না— এই সভ্য দেশে, যদি এই দেশ সভ্য হয়, হওয়া উচিত? অবশ্য এই দেশ উচিত অনুচিতের ধার ধারে না। সরকার যদি সবচেয়ে বড় সেবক হন, তিনিই তো ধর্ষণ করছেন তাবৎ জনগণকে, সম্ভবত সে কারণেই ছোট ছোট সেবকের ছোট ছোট ধর্ষণ তিনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন। এছাড়া আর কী, এছাড়া কী যুক্তি

১

দিয়ে চাকরি করাবার জন্য অর্ধ সেক্সের ব্যাপার। সেক্স যতদিন টইটম্বুর, মেয়েদের ততদিন চাকরি করতে দেওয়া হয়। সেক্স শেষ তো চাকরি শেষ।

২.

এয়ারহোস্টেসদের মেটারনিটি লিভ পাওয়ার কথা ন'মাস। কারণ হাই এলটিচুডে ফ্লাই করা উচিত নয় প্রেগনেন্ট মেয়েদের। ন'মাস মেটারনিটি লিভের তিন মাস বেতন পায় তারা, বাকি ছ'মাসের বেতন পায় না। নিজের অর্জিত ছুটি থেকে কেটে নেওয়া হয় এই লিভ। মেটারনিটি লিভ নেওয়া মানে অর্জিত ছুটি খোয়ানো, বেতনবিহীন ছুটি পোহানো,চাকরির সিনিয়রিটি নষ্ট হওয়া ইত্যাদি। গর্ভবতী হওয়া প্রাকৃতিক একটি পদ্ধতি। এই প্রাকৃতিক পদ্ধতির কারণে একজন চাকরিজীবী মেয়ের কেন ভোগান্তি হবে। কেন সে বঞ্চিত হবে তার প্রাপ্য থেকে?

৩.

এয়ারহোস্টেসদের যে পঁয়ত্রিশের পর বিদেয় করে দেওয়া হয়, কোনও ক্ষতিপূরণ কিন্তু তাদের দেওয়া হয় না। অন্য পেশাজীবীদের কিন্তু সময়ের আগে রিটায়ার করালে কমপেনশেসন দেওয়া হয়। সেনাবাহিনীর লোকেরা রিটায়ারের পর রেশন পায়, সিএমএইচ-এর চিকিৎসা পায় ফ্রি। একজন পাইলটও যদি সাতান্ন বছর বয়সের আগে অবসর নেন, তার অবসরকালীন ভাতা এবং পারিতোষিক ছাড়াও সাড়ে চৌদ্দ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ পায়। শুধু তাই নয় রিটায়ার্ড পাইলট তার পুরো ফ্যামিলির সমস্ত খরচ পায়। চিকিৎসার যাবতীয় খরচও। এ কথা ঠিক যে বড় চাকুরেদের চেয়ে ছোট চাকুরে কম সুযোগ সুবিধে পায়। তাই বলে এমন নির্লজ্জ বৈষম্য মেনে নিতে হবে কেন?

বীমার বেলায়ও সাধারণ যাত্রীর চেয়েও কেবিন ক্রুদের মূল্য কম। সাধারণ যাত্রীর জন্য চার লাখ টাকা, এক্সিকিউটিভ ক্লাসের জন্য পাঁচ লাখ, পাইলটের জন্য সাড়ে বারো লাখ আর কেবিন ক্রুর জন্য দুই লাখ পঞ্চান্ন হাজার। ট্রানজিট ফ্লাইটে বিদেশের একই হোটেলে বাস করতে দেওয়া হয় কেবিন ক্রু এবং পাইলটকে। যদিও ডিএ পাচ্ছে দুজনে দুরকম। খাবার খরচ ভিন্ন হলে হোটেলের স্ট্যান্ডার্ডও ভিন্ন হওয়া উচিত।

৪.

বিমানবালা যদি প্রমোদবালা না হয় তবে তাদের ফ্লাইট এটেনডেন্ট অথবা কেবিন ক্রু নামে ডাকা হয়।

৫.

বাংলাদেশ বিমানে নতুন নিয়ম শুরু হয়েছে। কেবিন ক্রুদের পাঁচ বছরের চুক্তিতে চাকরিতে নেওয়া হচ্ছে। পাঁচ বছর পর পছন্দ হলে সময় বাড়াবে, পছন্দ না হলে বাড়াবে না। অর্থাৎ চাকরি নট। এও এক ধরনের অনিশ্চয়তা। একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশায় এই অনিশ্চয়তার খেলা মানুষকে অস্থিরতায় ভোগায়। কাজে ধৈর্য ও একাগ্রতা থাকে না।

আশি সাল থেকে পঁয়ত্রিশের এবং পঁয়তাল্লিশের যে বয়স মাপা চলছে, তা অচিরে বন্ধ হওয়া উচিত। তারা সম্মানিত পেশায় আছে, তারা বেশ্যা নয় যে যৌবন ফুরোলে আর ডাকবে না। অথচ এয়ারহোস্টেসদের বেশ্যা জ্ঞান করছে বিমান কর্তৃপক্ষ। তাদের গর্ভধারণ করাতেও বোধহয় কর্তৃপক্ষের প্রবল আপত্তি,তা নাহলে ন'মাস কেন তারা মেটারনিটি লিভ পাবে না! কেন তাদের সঞ্চিত ছুটি থেকে মেটারনিটি লিভ কাটতে হবে। কেন তারা পঁয়ত্রিশ বছরে চাকরি হারাবার পর ক্ষতিপূরণ পাবে না? আমার এই প্রশ্নে অনেকে বলবেন— একরকমই নিয়ম। আমার তবে আরও একটি প্রশ্ন — এরকম নিয়ম কেন? কেন এই অসাম্য, কেন এই বৈষম্য, কেন নারী শোষণের বর্বর নিয়ম বাংলাদেশ বিমানে বিরাজ করছে?

হায় হায় দিন, ঢাকা

সেদিন কলকাতা থেকে একজন আমাকে ফোনে (সরকার আমার পাসপোর্টটি কেড়ে নিয়েছেন যেন আমি দেশের বাইরে যেতে না পারি, কিন্তু ফোনের লাইনটি দয়া করে এখনও অক্ষত রেখেছেন) জানালেন ভারতের মুসলিম বোর্ড ফতোয়া দিয়েছে তিন তালাক বললে আর তালাক হবে না। কণ্ঠটিতে উপচে পড়ছিল আনন্দ, যেন বড় কোনও বিজয় জুটেছে। শুনে আমি কোনও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিনি। কারণ যে দেওয়াল এখন ভেঙে ফেলা প্রয়োজন, সেই দেওয়ালের গায়ে একটি ফুটো করতে পারা এমন কোনও বীরত্ব নয়। ভারতের মুসলমানেরা এখনও শরিয়া আইনে চলে। তালাক বললেই তালাক হয়ে যায়, চাইলেই চারটে বিয়ে (এদেশে আবার চং এর একটা অনুমতি লাগে) করা যায়, স্ত্রীদের অধিকার নেই স্বামীকে তালাক দেবার। হায়দরাবাদের এক অবাঙালি মুসলমান মেয়ে সেদিন মুসলমানদের ঘটে কী কী সার পদার্থ আছে তার খবর জানিয়ে দুঃখ করে বলেছিল—বিজেপি ক্ষমতায় এলে আমাদের ভালই হবে। আমি আঁতকে উঠেছিলাম শুনে, বলে কী মেয়ে! বিজেপি আবার মুসলমানের কী মঙ্গল করবে অমঙ্গল ছাড়া? মেয়েটি বলেছিল—বিজেপি সারা ভারতে ১৯৫৬ সনের হিন্দু এ্যাক্ট চালু করবে, যেখানে নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা লেখা আছে। যদি তাই হয় মুসলমানের জন্য এটি সুসংবাদ নিশ্চয়, মেয়েরা পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের সমান অধিকার পাবে, তালাক বললেই তালাক হবে না, খোরপোষ দেনমোহরের ভণ্ডামি দূর হবে, স্ত্রীদের অধিকার থাকবে বর্বর স্বামীকে তালাক দেবার, এবং একাধিক স্ত্রী নিয়ে সংসার সাজাবার আরামটি পুরুষেরা আর পাবে না।

মেয়েটি আমাকে ভাবিয়েছিল বটে। ক'দিন আগেই বিজেপির দিল্লি অফিসে ভারতের মুসলমান নেতারা জুম্মার নামাজ আদায় করেছেন। এর পেছনে রাজনীতির জিলিপি আছে, তা জানি। একদল আরেকদলকে পেলে মনে হয় কচুকাটা করবে, সব আসলে ওপর ওপর। তলে তলে এর মন্দিরে ও নামাজ পড়ছে ওর মসজিদে এ পুজো করছে—অবশ্য এ কেবল নেতাদের বেলায় ঘটে। দুর্ভোগ হয়, সাধারণের—যারা জট বোঝে না, ঘট বোঝে না। এরকম সাধারণ, নির্বিরোধ, প্রগতির পক্ষের মেয়েকেই যদি নারী-পুরুষের সমান অধিকারের জন্য বিজেপির পক্ষ নিতে হয় তবে লজ্জা কী সেই মেয়ের একার না তাবৎ মুসলমানের! কেন তাকে উগ্র মৌলবাদী একটি দলকে সমর্থন করতে হয়?

বাংলাদেশের মত অশিক্ষিত অনগ্রসর ও ধর্মান্ধ দেশেও ১৯৬১ সনে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ জারি করা হয়। শরিয়া আইনের চেয়ে খুব একটা তফাৎ এতে নেই তবু তালাক উচ্চারণ করলেই তালাক হয় না, ইউনিয়ন পরিষদের কাছে নোটিশ দিতে হয়, সেই নোটিশের কপি স্ত্রীকে দিতে হয় এবং নোটিশ দেওয়ার নব্বই দিন (স্ত্রী তিনবার ঋতুমুক্ত হলে তার গর্ভে যে স্বামীর সন্তান নেই—এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্যই নব্বই দিনের এই হিসেব) পর তা কার্যকর হয়। এর কোনও একটি শর্ত পূরণ না হলে নব্বই দিন অর্থাৎ

ইদ্দতকাল পার হবার পরও তালাক কার্যকর হয় না। বহু বিবাহের বেলায়ও সালিশি পরিষদের অনুমতি লাগে, স্ত্রী বা স্ত্রীদের অনুমতির প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশেও এক সময় শরিয়া আইন চলেছে, আজ সেই আইনে যে যৎসামান্য পরিবর্তন হয়েছে, সেটুকুর হাওয়াও, বড় বিস্ময় এই, এতদিনে ভারতের গায়ে লাগেনি। একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ যদি তার সব ধর্মবিশ্বাসী নাগরিকের জন্য একটি আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ আইন প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে, তবে সেই দেশের ধর্মনিরপেক্ষতায় আমার অন্তত কোনও পক্ষপাত নেই। যদি বলা হয়, মোল্লারা মানে না বাগড়া দেয়—তারও উত্তর আছে—তারা মানবে না বলে রাষ্ট্র কেন তাদের পিটিয়ে মানুষ করবে না। ঘরে ইঁদুর মরা রেখে নাকে সুগন্ধি রুমাল চাপলেই কি দুর্গন্ধ যায়। পাঁঠাকে মানুষ করা ঝামেলা বড়—সে বুঝেই বলছি, মানুষ করা ছাড়া আর পথও নেই। মোল্লারা কবে একটু ছাড় দেবে তো মুসলমান মেয়েরা (শরিয়ার পাথর তো কেবল মেয়েদেরই চাপে) হাঁফ ছাড়বে—ভারতের মত অগ্রসর দেশে এ নিয়ম চলা উচিত নয়।

এ দেশের অবস্থাও অদ্ভুত। মেয়েরা তালাক দিতে পারবে কী পারবে না—কাবিন নামায় এরকম একটি প্রশ্ন জুড়ে দেওয়া হয়। স্বামীরা যদি করুণা করে মেয়েদের তালাক দেবার অধিকার দেন, তবেই হতভাগিরা সেই অধিকার পায়, তা না হলে তালাক দিতে কোর্টে দৌড়োতে হয়, কারণ দর্শাতে হয়। দেশের বড় বড় নায়িকা গায়িকাদেরও এই তালাকের অধিকার থাকে না, তাদেরও তাই মামলা করে বর্বর স্বামীকে তালাক দিতে হয়। মুসলমানরা সব ছাড়ে, ধর্ম পর্যন্ত ছাড়ে কিন্তু শরিয়া আইন ছাড়ে না।

ধর্মের নামে এইসব অনাচারের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে মুক্তি শুধু যে মুসলমানের নেই তা না, মুক্তি মানুষেরই নেই। গোটা উপমহাদেশে ধর্ম নিয়ে যে তাণ্ডব করছে অসভ্য মানুষেরা, মানুষকে যুক্তিহীন বোধহীন বোবা কালা করবার তাদের যে হীন চক্রান্ত—তা যদি এখনও সমূলে বিনাশ করা না যায় তবে অচিরে হাঁ মুখো অন্ধকার আমাদের এমন গ্রাস করবে যে আমরা আর আমাদের পড়শি চিনব না, স্বজন চিনব না, আমরা নিজেকে চিনতেও ভুল করব এবং আত্মঘাতী হব।

যায় যায় দিন, ঢাকা

উত্তরাধিকার-১

এদেশে উত্তরাধিকার আইনগুলো করা হয়েছে ধর্মমতে। মুসলমানদের উত্তরাধিকার এরকম—মৃত স্ত্রীর সন্তান বা সন্তানের সন্তান না থাকলে স্ত্রীর সম্পত্তি $\frac{১}{২}$ অংশ পায় স্বামী। মৃত স্ত্রীর সন্তানাদি থাকলে, তা সে ওই স্বামীর ঔরসজাত হোক বা না হোক, স্বামী $\frac{১}{৪}$ অংশ পায়। ঠিক একই রকম মৃত স্বামীর সন্তান বা সন্তানের সন্তান না থাকলে স্বামীর সন্তান বা সন্তানের সন্তান না থাকলে স্বামীর সম্পত্তির $\frac{১}{২}$ অংশ পাওয়া উচিত স্ত্রীর, কিন্তু স্ত্রী তা পায় না, পায় $\frac{১}{৪}$ অংশ। আর স্বামীর সন্তান থাকলে তবে স্ত্রী $\frac{১}{৪}$ অংশ না পেয়ে পায় $\frac{১}{৮}$ অংশ।

যদি কেউ তার মা ও বাবাকে রেখে মারা যায় তবে তার সম্পত্তির বণ্টন হবে এরকম, মা পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ, আর বাবা পাবে $\frac{২}{৩}$ অংশ। আর যদি তার মা, বাবা, ভাই ও বোনকে রেখে মারা যায় তবে মা পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ কারণ ভাই ও বোন আছে। দুই বা ততোধিক ভাই অথবা বোন থাকলে মা $\frac{১}{৬}$ অংশ পায়। না থাকলে $\frac{১}{৩}$ অংশ পায়। বাবা পাবে $\frac{৫}{৬}$ অংশ। ভাই এবং বোন পাবে না যেহেতু তাদের বাবা জীবিত আছে।

উত্তরাধিকার লাভের ক্ষেত্রে একজন কন্যার অংশ $\frac{১}{২}$ অংশ। দুই বা ততোধিক কন্যা থাকলে তারা সকলে মিলে $\frac{২}{৩}$ অংশ পায়। কিন্তু পুত্র থাকলে সেই কন্যা এগনেটিক ওয়ারিশ হিসেবে অর্থাৎ অবশিষ্টাংশে হিসেবে উত্তরাধিকার লাভ করে। একজন পুত্র ও কন্যার অনুপাত $\frac{২}{১}$। অর্থাৎ প্রতি পুত্র কন্যার দ্বিগুণ পায়। পুত্র পায় $\frac{২}{৩}$ অংশ। কন্যা পায় $\frac{১}{৩}$ অংশ।

এ হচ্ছে সুন্নী মুসলমানদের উত্তরাধিকার আইনের নিতান্তই অল্প কিছু উদাহরণ। এই যদি হয় উত্তরাধিকারের বৈষম্য তবে আমরা নিশ্চয় ভাবতে পারি মাতা ও পিতা সমান নয়, কন্যা ও পুত্র সমান নয়, স্ত্রী ও স্বামী সমান নয়। বৈষম্য আছে। এই বৈষম্য কেন? কেন মাতা, কন্যা ও স্ত্রী, পিতা, পুত্র ও স্বামীর সমান মর্যাদা পাবে না? এই বৈষম্য জলজ্যান্ত রেখে যে পুরুষ বা নারী ভাবে যে তারা তৃপ্ত, তারা সুখী, তারা সন্তুষ্ট তবে তারা নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়ছে, আর চতুর দর্শক দাঁড়িয়ে তাদের তালি দিয়ে অভিনন্দিত করছে। আমি চতুর নই বলে সম্পত্তি বণ্টনের নমুনা দেখে আর সব পুরুষের মত সুখে ও স্বস্তিতে গা এলাতে পারছি না। আমি সমাজের ধিকৃত, বঞ্চিত, ধর্ষিত,

নিরীহ, নিরুপায় নারী। উত্তরাধিকারের এই আইন আমি মানি না। সম্পত্তি সম বণ্টনের সুস্থ আইন চাই। আজ থেকে চাই। এই মুহূর্ত থেকে। দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীর গায়ে কি এই চরম বৈষম্যের কোনও ছোঁয়া লাগে না? আমার তো লাগে, তাঁর লাগে না কেন? তিনি যদি মানুষ হন, নারী হন, বিবেকবান হন, বুদ্ধিমান হন, তিনি যদি সৎ হন, নিষ্ঠ হন তাঁর হৃদয়ে চাবুক পড়বেই অসম ব্যবস্থার।

লোকে বলে বাবার সম্পত্তি যদি কন্যারা নেয়, 'সয় না'। বাবার সম্পত্তি কন্যার সয় না। ও কেবল পুত্রের সয়। যেন সব সওয়ার কাজ 'শিশ্ন' করে। শিশ্ন যাদের নেই, তাদের গায়ে সম্পত্তির কাঁটা ফোটে, সে মারা পড়ে। এইসব বলে কন্যাকে বিমুখ করতে চায় ধূর্ত লোকেরা। কন্যাকে শেষ অবধি বঞ্চিত করে তারা।

মাতৃকুলের চেয়ে পিতৃকুল বেশি লাভবান হয় সম্পত্তি ভোগের ক্ষেত্রে। মামা ও খালার চেয়ে কাকা ও ফুপু পায় বেশি। কাকা ও ফুপু পায় $\frac{২}{৩}$ অংশ, আর মামা ও খালা পায় $\frac{১}{৩}$ অংশ। মাতৃকুল ঠকে, মা ঠকে, কন্যা ঠকে, স্ত্রী ঠকে। ঠকাবার নিয়ম তৈরি করেছে শরিয়া বিধি। শরিয়া বিধির থাবা উত্তরাধিকারের শরীর খামচে ধরেছে।

নারী কখনও কোনও সম্পত্তির 'অংশীদার' নয়। সে 'অবশিষ্টাংশভোগী'। অবশিষ্টাংশভোগীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈধ উত্তরাধিকারী। নারী যেমন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, তেমনি দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারী। অবশিষ্ট যা থাকে, তা পায়। বাড়ির পুরুষেরা খেয়েদেয়ে যা থাকে, তা যেমন নারীরা খায়। তেমন সম্পত্তিও পুরুষ অংশীদাররা নিয়ে টিয়ে তলানিতো যা থাকে, নারী পায়। স্ত্রী, কন্যা, মা বোন, বৈপিত্রেয় বোন, সকলেই সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ পায়। কেউই অংশীদার নয়। কেউই প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারী নয়। এই অবশিষ্টাংশ ভোগ করবার বেলায়ও সমাজের সাত লোকের বাধা, তারা বলে 'মেয়েরা সম্পত্তি নিলে সম্পত্তি সয় না।'

সম্পত্তি সওয়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। 'সয় না' বলে সেগুলো পুরুষের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করা চলবে না। পিতার সমান মাতাকে, পুত্রের সমান কন্যাকে, স্বামীর সমান স্ত্রীকে সমান উত্তরাধিকার দেবার ব্যবস্থা করা হলে সব সইবে। আর তা না করলে যে সরকার আমাদের আইনের মাথা, তাঁকে কিন্তু আমরা বেশিদিন 'সইব' না।

যায় যায় দিন, ঢাকা

মুসলমানদের উত্তরাধিকার নিয়ে লিখছি, মেয়েদের যেখানে নির্লজ্জভাবে ঠকানো হয়েছে। মেয়েদের যে কেবল ইসলাম ধর্মেই ঠকানো হয়েছে তা নয়। প্রায় সব ধর্মেই এই অবস্থা। বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী মেয়েরা কি কম নিগ্রহ ভোগ করছে? হিন্দু উত্তরাধিকার আইন দুটো মতপন্থী, এক মিতাক্ষরা দুই দায়ভাগ। বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও মনিপুর প্রদেশের অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায় দায়ভাগ উত্তরাধিকার আইনে শাসিত এবং দায়ভাগ নীতির অনুসরণকারী। দায়ভাগ আইনে একজন হিন্দু তার প্রাপ্ত পৈত্রিক সম্পত্তিতে এবং নিজ পরিশ্রমে অর্জিত স্বোপার্জিত বিত্ত সম্পত্তিতে পূর্ণ সত্বাধিকারী। জীবিত অবস্থায় সে তার সব সম্পত্তি যে কোনও প্রকার হস্তান্তর করতে পারে। দায়ভাগ আইন অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির তিন শ্রেণীর উত্তরাধিকারী— সপিন্ড, সাকুল্য ও সমানোদক। যে ব্যক্তি পিন্ডদান করে, যে ব্যক্তি পিন্ড গ্রহণ করে এবং যে ব্যক্তি পিন্ডদানে অংশগ্রহণ করে তারা সকলেই পরস্পরের 'সপিন্ড'। যে আত্মীয়রা মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধের সময় পিন্ডে পিন্ডদেপ করে তারা মৃত ব্যক্তির 'সাকুল্য'। আর যে আত্মীয়রা মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধে পিন্ডে পিন্ডজল দেয়, তারা মৃত ব্যক্তির 'সমানোদক'।

পিতৃকুলের তিন পুরুষ, যেমন পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং মাতৃকুলের তিন পুরুষ যেমন মাতার পিতা, মাতার পিতার পিতা ও মাতার পিতার পিতার পিতাকে সপিন্ড ধরা হয়। কারণ মৃত ব্যক্তিটি জীবিত থাকাকালে তাদের উদ্দেশে পিন্ডদান করতে বাধ্য ছিল। মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধে পিন্ডদানকালে যারা পিন্ডদান করতে বাধ্য তারা সকলেই মৃত ব্যক্তির সপিন্ড। এই সকল সপিন্ড হচ্ছে পুত্রের তরফ পুত্র, পুত্রের পুত্র, পুত্রের পুত্রের পুত্র এবং কন্যার তরফে কন্যার পুত্র, পুত্রের কন্যার পুত্র, পুত্রের পুত্রের পুত্র। মৃত ব্যক্তি ছাড়া যে সকল ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির ওই উর্ধ্বতন পুরুষদের পিন্ডদান করতে বাধ্য, তারাও মৃত ব্যক্তির সপিন্ড। দায়ভাগ উত্তরাধিকার আইনের ক্রম অনুসারে সপিন্ডগণের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবস্থান।

১। পুত্র, ২। পৌত্র, ৩। প্রপৌত্র, ৪। বিধবা স্ত্রী—যদি পুত্র পৌত্র, প্রপৌত্র জীবিত না থাকে, ৫। কন্যা—পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ও বিধবা স্ত্রী জীবিত না থাকলে তার মৃত পিতার ত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে। অসতী, বন্ধ্যা, পুত্রহীনা এবং যে কন্যার কেবল কন্যা সন্তান আছে তারা পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হতে পারে না, ৬। কন্যার পুত্র—কন্যার মৃত্যুর পর কন্যার পুত্র সপিন্ড হিসাবে মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তিতে পূর্ণ সত্বাধিকারী হয়, ৭। পিতা, ৮। মাতা—দায়ভাগ উত্তরাধিকার আইন অনুসারে অসতী

মাতা মৃত পুত্রের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে পারে না, ৯। ভাই, ১০। ভ্রাতুষ্পুত্র, ১১। ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র, ১২। বোনের পুত্র, ১৩। পিতার পিতা, ১৪। পিতার মাতা, ১৫। পিতার ভাই, ১৬। তার পুত্র, ১৭। তার পৌত্র, ১৮। পিতার বোনের পুত্র, ১৯। পিতার পিতার পিতা, ২০। পিতার পিতার মাতা, ২১। পিতার খুড়া, ২২। তার পুত্র, ২৩। তার পৌত্র, ২৪। পিতার পিতার বোনের পুত্র, ২৫। পুত্রের কন্যার পুত্র, ২৬। পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র, ২৭। ভাইয়ের কন্যার পুত্র, ২৮। ভাইয়ের পুত্রের কন্যার পুত্র ২৯। খুড়ার কন্যার পুত্র, ৩০। খুড়ার পুত্রের কন্যার পুত্র, ৩১। পিতার খুড়ার কন্যার পুত্র, ৩২। পিতার খুড়ার পুত্রের কন্যার পুত্র, ৩৩। মাতার পিতা, ৩৪। মাতার ভাই, ৩৫। তার পুত্র, ৩৬। তার পৌত্র, ৩৭। মাতার বোনের পুত্র, ৩৮। মাতার পিতার পিতা, ৩৯। তার পুত্র, ৪০। তার প্রপৌত্র, ৪১। তার প্রপৌত্র, ৪২। তার কন্যার পুত্র, ৪৩। মাতার পিতার পিতার পিতা, ৪৪। তার পুত্র, ৪৫। তার পৌত্র, ৪৬। তার প্রপৌত্র, ৪৭। তার কন্যার পুত্র, ৪৮। মাতার পিতার পুত্রের কন্যার পুত্র, ৪৯। তার পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র, ৫০। মাতার পিতার পিতার পুত্রের কন্যার পুত্র, ৫১। তার পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র, ৫২। মাতার পিতার পিতার পিতার পুত্রের কন্যার পুত্র, ৫৩। তার পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র।

তিপ্পান্নজন সপিন্ড অর্থাৎ উত্তরাধিকারী তবে কারা? সবই পিতা, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র। স্ত্রী, কন্যা, মাতা যদি সম্পত্তি পায় তবে পুরুষ উত্তরাধিকারীরা কেউ জীবিত না থাকলেই কেবল পায় তাও নানা শর্তে। অসতী হলে, বন্ধ্যা হলে, পুত্রহীনা হলে সম্পত্তি পাবে না। পিতা, পুত্র, পৌত্ররা অসৎ হলেও সম্পত্তি পাবে। আপত্তি কেবল নারীর বেলায়। ক্রম অনুসারে উত্তরাধিকারীদের পরিচয় দেখলে যে কোনও মানুষই সে যদি মানুষ হয় বিস্মিত হতে বাধ্য। কারণ, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র সম্পত্তি পেতে পেতে কন্যা জীবিত অবস্থায় থাকে না, বিধবা স্ত্রীও থাকে না, তাদের সম্পত্তি পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। এরপর কন্যার পুত্র যদিও লাইনে আছে, কন্যার কন্যা কিন্তু নেই। ভাই আছে ভ্রাতুষ্পুত্র আছে, ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র আছে, বোনের পুত্র আছে, কিন্তু বোন নেই, বোনের কন্যা নেই, বোনের কন্যার কন্যা নেই। পিতার ভাই, তার পুত্র, তার পৌত্র আছে কিন্তু পিতার বোন, বা তার কন্যা নেই উত্তরাধিকারের তালিকায়। এমনকি পিতার খুড়া, তার পুত্র, তার পৌত্র, পিতার পিতার বোনের পুত্র, পুত্রের কন্যার পুত্র, পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র অবধি আছে কিন্তু খুড়ার কোনও কন্যা নেই, পিতার পিতার বোনের কন্যা নেই, অথবা পুত্রের কন্যার কন্যাও নেই। মাতার ভাই, পিতা, মামার পুত্র, পৌত্র, পৌত্র প্রপৌত্রও সম্পত্তি পেতে পারে কিন্তু মাতার বোন নয়, মা নয়, মামার কন্যা নয়, দৌহিত্র নয়। বিত্ত যোগে সম্পত্তি যাচ্ছে তবু কোনও নারীর কাছে যাচ্ছে না। মাতার বোন পাচ্ছে না, কিন্তু

মুসলমানদের উত্তরাধিকার নিয়ে লিখেছি, মেয়েদের যেখানে নির্লজ্জভাবে ঠকানো হয়েছে। মেয়েদের যে কেবল ইসলাম ধর্মেই ঠকানো হয়েছে তা নয়। প্রায় সব ধর্মেই এই অবস্থা। বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী মেয়েরা কি কম নিগ্রহ ভোগ করছে! হিন্দু উত্তরাধিকার আইন দুটো মতপন্থী, এক মিতাক্ষরা দুই দায়ভাগ। বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও মণিপুর প্রদেশের অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায় দায়ভাগ উত্তরাধিকার আইনে শাসিত এবং দায়ভাগ নীতির অনুসরণকারী। দায়ভাগ আইনে একজন হিন্দু তার প্রাপ্ত পৈত্রিক সম্পত্তিতে এবং নিজ পরিশ্রমে অর্জিত যোপার্জিত ভিন্ন সম্পত্তিতে পূর্ণ সত্বাধিকারী। জীবিত অবস্থায় সে তার সব সম্পত্তি যে কোনও প্রকারে হস্তান্তর করতে পারে। দায়ভাগ আইন অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির তিন শ্রেণীর উত্তরাধিকারী— সপিন্ড, সাকুল্য ও সমানোদক। যে ব্যক্তি পিন্ডদান করে, যে ব্যক্তি পিন্ড গ্রহণ করে এবং যে ব্যক্তি পিন্ডদানে অংশগ্রহণ করে তারা সকলেই পরস্পরের 'সপিন্ড'। যে আত্মীয়রা মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধের সময় পিন্ডে পিন্ডলেপ করে তারা মৃত ব্যক্তির 'সাকুল্য'। আর যে আত্মীয়রা মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধে পিন্ডে পিন্ডজল দেয়, তারা মৃত ব্যক্তির 'সমানোদক'।

পিতৃকুলের তিন পুরুষ, যেমন পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং মাতৃকুলের তিন পুরুষ যেমন মাতার পিতা, মাতার পিতার পিতা ও মাতার পিতার পিতার পিতাকে সপিন্ড ধরা হয়। কারণ মৃত ব্যক্তিটি জীবিত থাকাকালে ওদের উদ্দেশে পিন্ডদান করতে বাধ্য ছিল। মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধে পিন্ডদানকালে যারা পিন্ডদান করতে বাধ্য তারা সকলেই মৃত ব্যক্তির সপিন্ড। এই সকল সপিন্ড হচ্ছে পুত্রের তরফ পুত্র, পুত্রের পুত্র, পুত্রের পুত্রের পুত্র এবং কন্যার তরফে কন্যার পুত্র, পুত্রের কন্যার পুত্র, পুত্রের পুত্রের পুত্র। মৃত ব্যক্তি ছাড়া যে সকল ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির ওই উর্ধ্বতন পুরুষদের পিন্ডদান করতে বাধ্য, তারাও মৃত ব্যক্তির সপিন্ড। দায়ভাগ উত্তরাধিকার আইনের ক্রম অনুসারে সপিন্ডগণের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবস্থান।

১। পুত্র, ২। পৌত্র, ৩। প্রপৌত্র, ৪। বিধবা স্ত্রী—যদি পুত্র পৌত্র, প্রপৌত্র জীবিত না থাকে, ৫। কন্যা—পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ও বিধবা স্ত্রী জীবিত না থাকলে তার মৃত পিতার ত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে। অসতী, বন্ধ্যা, পুত্রহীনা এবং যে কন্যার কেবল কন্যা সন্তান আছে তারা পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হতে পারে না, ৬। কন্যার পুত্র—কন্যার মৃত্যুর পর কন্যার পুত্র সপিন্ড হিসাবে মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তিতে পূর্ণ সত্বাধিকারী হয়, ৭। পিতা, ৮। মাতা—দায়ভাগ উত্তরাধিকার আইন অনুসারে অসতী

মাতা মৃত পুত্রের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে পারে না, ৯। ভাই, ১০। ভ্রাতুষ্পুত্র, ১১। ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র, ১২। বোনের পুত্র, ১৩। পিতার পিতা, ১৪। পিতার মাতা, ১৫। পিতার ভাই, ১৬। তার পুত্র, ১৭। তার পৌত্র, ১৮। পিতার বোনের পুত্র, ১৯। পিতার পিতার পিতা, ২০। পিতার পিতার মাতা, ২১। পিতার খুড়া, ২২। তার পুত্র, ২৩। তার পৌত্র, ২৪। পিতার পিতার বোনের পুত্র, ২৫। পুত্রের কন্যার পুত্র, ২৬। পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র, ২৭। ভাইয়ের কন্যার পুত্র, ২৮। ভাইয়ের পুত্রের কন্যার পুত্র ২৯। খুড়ার কন্যার পুত্র, ৩০। খুড়ার পুত্রের কন্যার পুত্র, ৩১। পিতার খুড়ার কন্যার পুত্র, ৩২। পিতার খুড়ার পুত্রের কন্যার পুত্র, ৩৩। মাতার পিতা, ৩৪। মাতার ভাই, ৩৫। তার পুত্র, ৩৬। তার পৌত্র, ৩৭। মাতার বোনের পুত্র, ৩৮। মাতার পিতার পিতা, ৩৯। তার পুত্র, ৪০। তার প্রপৌত্র, ৪১। তার প্রপৌত্র, ৪২। তার কন্যার পুত্র, ৪৩। মাতার পিতার পিতার পিতা, ৪৪। তার পুত্র, ৪৫। তার পৌত্র, ৪৬। তার প্রপৌত্র, ৪৭। তার কন্যার পুত্র, ৪৮। মাতার পিতার পুত্রের কন্যার পুত্র, ৪৯। তার পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র, ৫০। মাতার পিতার পিতার পুত্রের কন্যার পুত্র, ৫১। তার পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র, ৫২। মাতার পিতার পিতার পিতার পুত্রের কন্যার পুত্র, ৫৩। তার পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র।

তিপ্পান্নজন সপিন্ড অর্থাৎ উত্তরাধিকারী তবে কারা? সবই পিতা, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র। স্ত্রী, কন্যা, মাতা যদি সম্পত্তি পায় তবে পুরুষ উত্তরাধিকারীরা কেউ জীবিত না থাকলেই কেবল পায় তাও নানা শর্তে, অসতী হলে, বন্ধ্যা হলে, পুত্রহীনা হলে সম্পত্তি পাবে না। পিতা, পুত্র, পৌত্ররা অসৎ হলেও সম্পত্তি পাবে। আপত্তি কেবল নারীর বেলায়। ক্রম অনুসারে উত্তরাধিকারীদের পরিচয় দেখলে সে কোনও মানুষই সে যদি মানুষ হয় বিস্মিত হতে বাধ্য। কারণ, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র সম্পত্তি পেতে পেতে কন্যা জীবিত অবস্থায় থাকে না, বিধবা স্ত্রীও থাকে না, তাদের সম্পত্তি পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। এরপর কন্যার পুত্র যদিও লাইনে আছে, কন্যার কন্যা কিন্তু নেই। ভাই আছে ভ্রাতুষ্পুত্র আছে, ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র আছে, বোনের পুত্র আছে, কিন্তু বোন নেই, বোনের কন্যা নেই, বোনের কন্যার কন্যা নেই। পিতার ভাই, তার পুত্র, তার পৌত্র আছে কিন্তু পিতার বোন, বা তার কন্যা নেই উত্তরাধিকারের তালিকায়। এমনকি পিতার খুড়া, তার পুত্র, তার পৌত্র, পিতার পিতার বোনের পুত্র, পুত্রের কন্যার পুত্র, পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র অবধি আছে কিন্তু খুড়ার কোনও কন্যা নেই, পিতার পিতার বোনের কন্যা নেই, অথবা পুত্রের কন্যার কন্যাও নেই। মাতার ভাই, পিতা, মামার পুত্র, পৌত্র, পৌত্র প্রপৌত্রও সম্পত্তি পেতে পারে কিন্তু মাতার বোন নয়, মা নয়, মামার কন্যা নয়, দৌহিত্র নয়। ভিন্ন গোত্রে সম্পত্তি যাচ্ছে তবু কোনও নারীর কাছে যাচ্ছে না। মাতার বোন পাচ্ছে না, কিন্তু

মাতার বোনের পুত্র পাচ্ছে। মাতার পিতার পিতার কন্যা পাচ্ছে না, কিন্তু সেই কন্যার পুত্র পাচ্ছে। মাতার পিতার পুত্রের কন্যা পাচ্ছে না, কিন্তু সেই কন্যার পুত্র পাচ্ছে। উত্তরাধিকারের এই নমুনাই কি স্পষ্ট করে না নারীর তুলনায় পুরুষের আধিপত্য, প্রভাব, পুরুষের দৌরাত্ম্য আর ধৃষ্টতা?

সাকুল্য ও সমানোদকও পিতার পিতা তস্য পিতা, পুত্রের পুত্র তার পুত্র, তার পৌত্র ও প্রপৌত্ররাই। কোনও নারীর চিহ্ন নেই এই উত্তরাধিকারীর তালিকায়। নারীরা কিছু পাবার বেলায় নেই, কেবল দেবার বেলায় আছে। লোকে ভাবে, নারীর আর কী দরকার সম্পদ সম্পত্তির? তাকে পিতা স্বামী ও পুত্রের অধীনে বেঁচে থাকতে হয়। তাকে পরাশ্রয়ী লতার মতো আঁকড়ে থাকতে হয় পুরুষের শরীর। নারীকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হতে দিতে সমাজ বড় নারাজ। সমাজ তাকে নিঃস্ব করেছে সর্বার্থে, তাকে অচল করেছে, অনাথ করেছে।

যায় যায় দিন, ঢাকা

১. মুসলিম ও হিন্দুর উত্তরাধিকার নিয়ে গত দুই সংখ্যায় লিখেছি। খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধদের উত্তরাধিকার নিয়ে কিছু না লিখলে অপূর্ণ থেকে যায় নিশ্চয়ই। আজ খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধদের সম্পর্কে লিখব।

১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন এর ২৪-২৮ (অংশ ৪) এবং ২৯-৪৯ (অংশ ৫) ধারাসমূহ বাংলাদেশ ও ভারতের খ্রিষ্টানদের জন্য প্রযোজ্য। বংশ ও পূর্ব পুরুষ থেকে আসা ব্যক্তিরা পরস্পরের সগোত্রীয়। সগোত্ররা হচ্ছেন পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, প্রপিতামহের পিতা এবং আরেকদিকে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র। পিতার দিক থেকে ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র। পিতামহের দিক থেকে পিতার ভাই অর্থাৎ খুড়া, জ্যাঠা, খুড়াতো ভাই ও বোন, খুড়াতো ভাই ও বোনের পুত্র, খুড়াতো ভাই ও বোনের পৌত্র। প্রপিতামহের দিক থেকে পিতামহের ভাই, পিতার খুড়াজ্যাঠার পুত্র, পিতার খুড়াজ্যাঠার পুত্রের পুত্র। আর প্রপিতামহের পিতার দিক থেকে সগোত্র হচ্ছেন প্রপিতামহের ভাই। সগোত্রে নারী বলতে নেই। খুঁজে দেখলে খুড়াতো বোনের একটি অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তাও বড় ক্ষীণ।

১৯৫৬ সালের ভারতীয় সংশোধিত হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের আওতাভুক্ত বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়। যদিও এই আইন বাংলাদেশে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে এখনও গৃহীত হয়নি। বাংলাদেশের মারুয়া বৌদ্ধ ছাড়া বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার দায়ভাগ হিন্দু আইনের আওতাভুক্ত ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগণ এবং বাংলার মারুয়া বৌদ্ধগণ ব্রহ্মদেশীয় উত্তরাধিকার মেনে চলে, তার ক্রম এরকম-১. পুত্রসন্তান, ২. পৌত্র, ৩. প্রপৌত্র, ৪. দত্তক পুত্র, ৫. সধমাতার পুত্র, ৬. অবৈধ সন্তান ও অবৈধ সংপত্নীর সন্তান, ৭. ভাই ও বোন, ৮. পিতামাতা, ৯. পিতার পিতামাতা, ১০. দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় (ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রী, ভগ্নি, ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রীর সন্তানগণ, কাজিন, ভ্রাতুষ্পুত্রের ও পুত্রীর পৌত্র ও পৌত্রীগণ, কাজিনের সন্তানগণ, কাজিনের পৌত্র সন্তানগণ, কাজিনের প্রপৌত্র সন্তানগণ) উত্তরাধিকার পায়, কাজিনের পৌত্র, প্রপৌত্রও পায়, তবু নিজের কন্যা পায় না।

এ অবশ্য বাংলাদেশের বৌদ্ধদের আইন নয়। ১৯৫৬ সালের হিন্দু সাকশেসন এক্ট ব্রহ্মদেশের আইনের তুলনায় অনেক উন্নত। বাংলাদেশে বহাল হিন্দু মুসলিম খ্রিষ্টানদের উত্তরাধিকার আইনের তুলনায়ও সেটি উন্নত।

২. আমাকে অনেকে বলেছে আমি নাকি খুব কঠিন জিনিস নিয়ে লিখছি। কঠিন জিনিস মানে উত্তরাধিকার আইন। কঠিন কেন জিজ্ঞেস করলে কিছু মেয়ে বলল এসব বুঝিটুঝি না। বললাম, তা বুঝবে কেন, বুঝলে কি আর 'সব পেয়েছি'র হাসি ঝোলে ঠোঁটে! এক তৃপ্ত থাকে হৃদয়।

ওরা আমার এই তিরস্কারও বুঝল কি না জানি না তবে ওরা অনুরোধ করে গেল উত্তরাধিকারের কাঠখোট্টা আলোচনা বাদ দিয়ে পুরুষদের কি করে পেটানো যায় তা যেন লিখি।

উত্তরাধিকারের ঝামেলায় কেউ যেতে চায় না। এটা ঝামেলা ছাড়া আর কী। এক দিকে নিয়ে শরিকে ঝগড়া, আর নিজের ভাইদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করা ঠিক শোভন মনে হয় না। আপন ভাইই তো, না হয় নিলই সব। আর বাপের বাড়ির জমি, এটির ভাগ চাইলে লোকে লোভী ভাববে। বাপ তো বিয়ের আগ অবধি খাওয়াদাওয়া পরালেন, এখন স্বামী খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে, অসুবিধে তো কিছুতে নেই। খামোকা ঝগড়ার মত বাপের মুরুব্বি জমির ওপর ছুরি চালিয়ে [illegible] আর পড়তে হবে কেন। এই হল আমাদের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত নারীদের মানসিকতা। আর নিম্নবিত্তের তো জমিই নেই, যদিও বা থাকে তার ভাগ চাইতে এলে ভাইয়েরা চেঁচিয়ে বিদেয় করে।

কিন্তু এই ঘটনাগুলো আর ক দিন ঘটবে? ক দিন আমাদের নিরীহ, নির্বোধ, প্রতারিত মেয়েরা ভাববে যে পিতার সম্পত্তি কেবল পুত্রদের জন্য, কন্যাদের জন্য নয়, আর কন্যাদের জন্য হলেও তা ছিটেফোঁটা। এই বাবস্থাটিকে তারা কেন মাথা পেতে বরণ করে নেবে? কবে তাদের বোধ হবে যে পিতার সম্পত্তিতে পুত্র ও কন্যার সমান অধিকার থাকা উচিত। কারণ কন্যা কোনও পতিত মানুষ, সে পুত্রের তুলনায় কিছু 'কম সন্তান' নয়, কিছু 'কম মূল্যবান' নয়, কিছু 'কম মেধাবী' নয়। এই বোধ যখন হবে তখন সে নিজে 'উত্তরাধিকার আইনের' মাথাপেছন হতে পাকিয়ে দেবে এবং বলবে আমার যা কিছু প্রাপ্য তার সবই দাও, আমি কড়ায় গণ্ডায় সব হিসেব চাই। আমি এই ভাগের একে একে দান দক্ষিণা দিয়ে আসি নি। আমার বা, আমি তা একশ ভাগ চাই। আর পুত্র তৈরিতে একটি শুক্র এবং একটি ওভাম যেখানে লাগে, কন্যা তৈরিতে সেখানে আধা শুক্র বা আধা ওভাম লাগে না। তবে সম্পত্তির বেলায় আধা কেন?

পুরুষ-প্রতিনিধিরা সমাবেশে আন্দোলন করে। কিন্তু উত্তরাধিকার নিয়ে তারা কখনও বা শব্দ করে না। এ নিয়ে উচ্চবাচ্য হলেও এমনি চুপচুপ। আমি অনেক বিদুষী সমাজকর্মীকে জানি যারা দেশে দেশে ছবি দিয়েছে বেশ্যাদের অর্থের দিকে অধীন উকিয়ে। রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোনও প্রভাবের দেখলে তারা উত্তেজিত হন, কিন্তু ভবি বদীকে কোনও প্রেজুডিস বা বৈষম্য দেখলে তারা খুব শান্ত থাকেন, মোটেও উত্তেজিত হন না। যেন শরিয়তের মত আর কিছু না চলুক, উত্তরাধিকার আইন চলতে চলুক। বিয়ের ব্যবস্থাও চলুক। যেহেতু বহুবিবাহের সুবিধেদি আছে।

যা করবার তা নারীকেই করতে হবে। নারীর জন্য সুযোগ সুবিধে তৈরী করতে হবে নারীকেই। প্রতিবন্ধক সরাতে হবে তাকেই, তার পথ মসৃণ করবার দায়িত্ব তারই। আমাদের সমাজে সহজেই 'বেগম রোকেয়া' জন্মায়, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' জন্মায় না। তাই বহুবিবাহ ও বন্ধ হয় না। সম্পত্তির সমান অধিকারও জোটে না।

মেয়েদেরই তাই এক একজন 'জোন অব আর্ক' হতে হবে, বেবি প্রাণচক্রবর্তী, প্রীতিলতা, লীলা নাগ, বেগম রোকেয়া হতে হবে। মেয়েদের জলের মত স্রোত শক্ত থাকতে এবার লাঠালাঠি ছেড়ে ওঠা প্রয়োজন।

গৃহবধূদের বেতন কত হবে তা নিয়ে 'যায় যায় দিন' এখন চিন্তিত। কিন্তু গৃহবধূ সংসারের কাজকর্ম হিসেব করে নিজেদের জন্য একটি বেতন ধরে দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা মাস গেলে বেতন পাবেন, বাড়ির চুক্তি যেমন পায়। মেয়েদের নিয়ে মশকরা করলে একশ্রেণীর সুখ অর্জন হয়। তাই বোধহয় মশকরার হিড়িক চলছে সারা দেশে। এই দেশ তো আর অন্য কোনও সুখের যোগান দিতে পারে না, তাই মেয়ে মানুষ যোগান দিয়েই সুখ রক্ষা করতে হয়। গৃহবধূ কি তার স্বামীর বেতনভুক কর্মচারী? রান্না করা, কাপড় কাচা, ঘর পরিষ্কার করা, বাচ্চা পড়ানো, রাতে স্বামীকে সঙ্গ দেওয়া ইত্যাদি কাজের জন্য তার পারিশ্রমিক পেতে হবে, আর এই পারিশ্রমিকের টাকা দিয়ে কি করবে গৃহবধূ? স্বামীর জন্য শার্ট, নিজের জন্য শাড়ি, বাচ্চার জন্য খেলনা গাড়ি, ঘর সাজাবার জিনিস, রান্নার হাঁড়ি, পড়িয়ার এসবের বাইরে তার আর খরচ কী। খরচের জেরবা রক্ষা থাকা মানুষ খরচেই সাজাবে আবার। স্বামীর টাকা বেতন হিসেবে যখন স্ত্রীর হাতে যাবে, তখন স্ত্রীর কি সাধ্য আছে এই টাকা সে খরচ অর্থাৎ সংসারের বাইরে অন্য কোথাও খরচ করে আসুক। নিশ্চয় নয়। কারণ স্বামী হয়ত তার তুলনায় স্ত্রীকে বেতন দেবে, কিন্তু ঠিক দেবেই অথবা হিসেব চাইবেই এই টাকা সে কী খাতে খরচ করল। স্ত্রী যদি তার বাবা-মা, ভাই-বোনকে টাকাটি দান করে তবে স্বামীরা এত উদার নয় যে মনঃক্ষুন্ন হবে না এই ভেবে যে স্ত্রীর ভালবাসা কেবল বাপের বাড়ির প্রতি, স্বামী বা শ্বশুর বাড়ির প্রতি নয়। স্ত্রী যদি তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ চৈ করে টাকাটি খেয়ে ফুর্তি উড়িয়ে দেয় তবে বলা হবে–স্ত্রী অসম্ভব উগ্র, সংসারে উদাসীন, বেপরোয়া, অলক্ষ্মী, চরিত্রহীন ইত্যাদি। স্ত্রী যদি এই টাকাটা কেবল নিজের জন্য ব্যয় করে তবে বলা উচিত স্ত্রী খুব স্বার্থপর। আর যদি সে টাকাটা জমিয়ে রাখে তবে বলা হবে সে অসম্ভব কৃপণ প্রকৃতির। কিছুতেই নিস্তার নেই তার, স্বামীর দেওয়া বেতন সংসারে স্বামীর টাকার মতই তার ব্যয় করতে হবে সব সংসারেই চলতে হবে তবে আর টাকা কটি বেতন হিসেবে এক হাত থেকে আরেক হাতে আসবার প্রয়োজন কী। এক্ষেত্রে চুক্তির অনেকটা স্বাধীনতা আছে। চুক্তি তার বেতন কী খাতে খরচ করল তা নিয়ে কারও জিজ্ঞাসা নেই। চুক্তি যদি তার বেতনের টাকা কোনও জলে ফেলে দিয়ে আসে, এতে কারও প্রতিবাদ করবার নেই, কিন্তু স্ত্রী ফেললেই স্ত্রীকে নিরন্তর জবাব দিতে হবে, কেন সে জলে ফেলল, কেন এটি দিয়ে সে এই কাজটি করল না, ওই কাজটি করল না।

এর মানে এই যে, তোমাকে স্বাধীনতা দেওয়া হল, কিন্তু একটি বৃত্ত এঁকে দেওয়া হল যে এর বাইরে কোথাও যাওয়া চলবে না। তোমাকে এই টাকা কটি দেওয়া হল কিন্তু ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়া হল, এই টাকা দিয়ে তুমি এই এই করবে। ছোট ছেলেমেয়েদের যেমন নানা পরবে উৎসবে হাতে টাকা দেওয়া হয় বখশিশ হিসেবে, কিন্তু ছেলেমেয়েরা অভিভাবকের নির্দেশেই সেই টাকা খরচ করতে বাধ্য হয় যেমন আইসক্রিম কেনা যাবে না, বাঁশি কেনা যাবে না, বাজনাবাদ্যি—তাও না, কেনা যাবে একটি জামা অথবা একজোড়া জুতো। টাকা আসলে এমন

জোগাবার জন্য দেওয়া হয়। যেন হাতে দেওয়ার খুশিতে ওরা মগ্ন থাকে, টাকা তো হাতে ওদের থাকে না, তাই ওদের খুশি করা যায় টাকা ছুঁইয়ে। অনেকটা খেলায় জেতা সোনার কাপের মত। একটু ছুঁইয়ে সরিয়ে ফেলা হয়। আর ছুঁলেই খুশি থাকে যখন 'মেয়ে মানুষেরা' তখন না হয় একটু না হয় ছুঁতে দেওয়াও হল। অমল আনন্দে ডুবো থাক মিথ্যের পাত্রখানি। গৃহবধূদের পায়ে শেকল, হাতে শেকল, ঠোঁটে শেকল, মনে শেকল। এত বেশি শেকল পরা মানুষ হাতে টাকা নিয়ে করবে কী; নিয়মের বাইরে, দেওয়ালের বাইরে তাকে তো বেরোতে দিচ্ছে না কেউ। 'স্বাবলম্বী' হওয়া কতজনের কাছে কাড়ি কাড়ি টাকার মূল্য কিছু আছে? আসলে গৃহবধূর হাতে দেওয়া টাকা গৃহবধূর নিজের টাকা নয়। নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী টাকা খরচ করবার অধিকার তার নেই। তার চলবার, বলবার, দৌড়বার, টাকা খরচ করবার অধিকার এখনও অর্জিত হয়নি। স্বেচ্ছাচার তার পক্ষে সম্ভব নয়। স্বেচ্ছাচার অর্থ 'স্ব ইচ্ছা অনুযায়ী আচার' সম্ভব নয় কারণ সেই পরিবেশ সমাজে তৈরী হয়নি। আর তা যদি না হয়, নারী যদি স্বাবলম্বী না হয়, স্বাধীন না হয় তবে পরাধীনতার শেকলে আটকা রেখে তাকে যতই দুধভাত খেতে দেওয়া হোক সে পরাধীনই। বলদের গায়ে তেল দিলেও সে বলদ, তাকে কলুর তেল ভাঙানোর কাজই করতে হয়।

এক্ষেত্রে কিন্তু নারী মানুষ। যদিও তাকে বলদের কাজ করানো হয়, তাকে দিয়ে ধোপার, বাবুর্চির, ভৃত্যের, পতিতার, মালির চৌকিদারের কাজ করানো হয়—কারণ একই সঙ্গে একজন নারী বহু প্রতিভায় ভাস্বর হলে তবেই সে সার্থক গৃহবধূ। গৃহবধূদের অধস্তন কর্মচারী রূপে দেখতে কিছু পুরুষের সম্ভবত শখ হয়েছে তাই এটিকেও একটি আধুনিক প্রতিভা বিবেচনা করে তারা প্রস্তাব করছেন পোষা প্রাণীটিকে টাকা পয়সা দেবার। পোষা ময়নার প্রতি যেমন থাকে বাড়তি যত্ন।

স্বামী হবে বন্ধুর মত, প্রভু নয়, মালিক নয়। স্ত্রী তার বেতনভুক কর্মচারী নয়। নারীকে শিক্ষিত হতে হবে স্বাবলম্বী হতে হবে, সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। সংসার হবে দু'জনের বিশ্বাস ও ভালবাসার ক্ষেত্র, এখানের যা কিছু কাজ, তা দু'জন মিলেই করতে হবে। একজন আরেকজনের ওপর কিছু চাপিয়ে দিলে তা সংসার হয় না, হয় একটা বৈষম্যের ভাগাড়। আর বৈষম্যের ভাগাড়ে টাকার হাতবদল হলে বৈষম্যের কোনও হেরফের হয় না। আগে বৈষম্য ঘোচাবার সংগ্রাম করতে হবে। তাতে গৃহবধূদের অংশগ্রহণও জরুরী, তারা গৃহবধূ হিসেবে সংগ্রাম করবে না, করবে নারী হিসেবে। আর স্বামীর কাছ থেকে বেতন পাবার সংগ্রাম নয়, নিজেকে মানুষ হিসেবে সংসার সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সকল নারীকে, অর্জন করতে হবে মানুষের সবটুকু অধিকার। স্বামীর বেতন তাকে আর যাই দিক, 'মানুষ' হতে দেবে না—একথা সত্য বরং আধুনিকতার চাটনি (যা খেয়ে পেট ভরবে না কেবল জিভ জুড়োবে) দেবে, এও এক নতুন শৃঙ্খল বটে।

যায় যায় দিন, ঢাকা

আমার পাসপোর্টটি কবে পাব মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী?

আমি এই দেশের একজন অতি সাধারণ নাগরিক। মন্ত্রী নই, সচিব নই, রাজনীতিবিদ নই, শিল্পপতি নই, নিতান্তই এক নগন্য মানুষ আমি। গত তেইশে জানুয়ারি সকালে কলকাতার আবৃত্তিলোক আয়োজিত কবিতার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলাম, ওখানে অপেক্ষা করছিল আমার অসংখ্য অনুরাগী পাঠক, অথচ আমাকে ইমিগ্রেশন থেকে বলা হল আমাকে যেতে দেওয়া হবে না। কেন যেতে দেওয়া হবে না, আমার সরকারি অনুমতি নেই বাইরে যাবার, তাই। বেশ, ভাল কথা, সরকারি অনুমতি নিয়ে তবেই না হয় যাব কলকাতায়—এরকম ভাবলাম। অনুমতির কাগজপত্রে গত চব্বিশে জানুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের অ্যাপ্রুভাল নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে দিই। দিন পার হয়, মহাপরিচালক অনুমতি দেন না। কেন দেন না, খোঁজ নিয়ে জানলাম আমার ফাইলে তিনি ইনকিলাবের 'রিপোর্ট' সেঁটে বসে আছেন। এই ফাইল তিনি কাউকে দিচ্ছেন না। নিজের কোলে কাঁখে বয়ে বেড়াচ্ছেন। ইনকিলাবের রিপোর্টটি আমার পাসপোর্টকে ভুয়া পাসপোর্ট আখ্যা দিয়েছে এবং অপ্রাসঙ্গিকভাবে আমার লেখালেখি থেকে উদ্ধৃতি টেনে লিখেছে অচিরে আমার শাস্তি হওয়া জরুরি। পাসপোর্টের সঙ্গে লেখালেখির সম্পর্কটি আবিষ্কার করেছে 'ইনকিলাব' গোষ্ঠী। যেমন রহস্যজনকভাবে আবিষ্কার করেছে আমার পাসপোর্টের ছবি, যা তারা ছেপেছে পত্রিকায়।

কেন আমার 'বহির্বাংলাদেশ ছুটি' মঞ্জুর হবে না তা জানতে গেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে জানানো হয়েছে যেহেতু 'ইনকিলাবে লেখালেখি হচ্ছে' তাই। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওপর ইনকিলাবের প্রভাব এত বেশি যে আমি অবাক হয়েছি। আমি যদি বিভাগীয় দৃষ্টিতে কোনও অন্যায় করে থাকি, তবে তার শাস্তি কী হবে না হবে বা আদৌ হবে কিনা তা আমার বিভাগ অর্থাৎ স্বাস্থ্য বিভাগই দেখবে, নিশ্চয়ই 'ইনকিলাব' নয়। 'ইনকিলাব' আমার বিচারকর্তা নয়। কিন্তু 'বহির্বাংলাদেশ' ছুটির ব্যাপারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আচরণ এবং আমার পারসোনাল ফাইলে ইনকিলাবের রিপোর্ট সেঁটে রাখা দেখে সকলের ধারণা হবে ইনকিলাবই বোধহয় স্বাস্থ্য ও স্বরাষ্ট্রের মা বাপ। স্বরাষ্ট্র বলছি এজন্য যে ইনকিলাবের রিপোর্ট 'পুলিশের বিশেষ শাখায়ও আশীষ বাণী বয়ে এনেছে। তারাও আমার ফাইল খুলে ইনকিলাব যা বলে, সেইমত কাজ করেছে। আমার বই পড়েছে লাল কালির দাগ দিয়ে দিয়ে।

যখন এই লেখা লিখছি তখন আমার পাসপোর্টটি নিয়ে যাবার পর তিনমাস এগারো দিন পেরিয়েছে। এই তিন মাস এগারো দিনে আমাকে স্বাস্থ্য ও স্বরাষ্ট্র থেকে কিছুই জানানো হয় নি। যেহেতু এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশান আমাকে বলেছিল 'এসবি' অফিস থেকে পাসপোর্টটি নিয়ে নেবেন। 'এসবি' অফিসে সেই মত গিয়ে এবং দিনের পর দিন লোক পাঠিয়ে আমাকে হতাশ হতে হয়েছে। মৌলবাদী গোষ্ঠীর প্রতিটি পত্রিকা সমস্ত প্রচার করেছে আমার পাসপোর্টটি 'ভুয়া' ছিল। অথচ পাসপোর্টে আমারই নাম, আমারই বাবার নাম, ঠিকানা, আমারই উচ্চতা, বাঁ চোখের ওপর আমার কালো তিলটির কথাই লেখা। পত্রিকায় কলাম

লিখবার কারণে পেশার ঘরে লেখা ছিল সাংবাদিকতা। সাংবাদিকতার কাজটি আমার ভাল লাগে বলেই দেওয়া। আমি পেশার ঘরে কবি বা লেখকও দিতে পারতাম। আরেকদিকে আমি চিকিৎসকও বটে। আমার অনেক পেশাই থাকতে পারে এবং আমার পছন্দের কোনও পেশাও থাকতে পারে। অনেক পেশার একটি উল্লেখ করা এবং দেশের বাইরে যাবার জন্য সরকারের অনুমতি না নেওয়া—এ নিতান্তই টেকনিক্যাল ত্রুটি। এই ত্রুটির কারণে পাসপোর্ট নিয়ে নেওয়া এবং প্রায় সাড়ে তিনমাসেও এটি ফেরত না দেওয়া নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত নয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যখন আমাকে বহির্বাংলাদেশ ছুটি দিচ্ছিল না, তখন আমি সরকারি চাকরিতে স্বেচ্ছায় ইস্তফা দিই। আশ্চর্য যে, এই ইস্তফা পত্রটিও গ্রহণ করবার কোনও তাগিদ অনুভব করছে না ওপরওলারা। যেখানে যে আবেদনপত্রই আমি দিয়েছি, সব স্থবির পড়ে আছে। স্বাস্থ্য সচিবকেও আমি দরখাস্ত পাঠিয়েছি এই বলে যে হয় আমাকে বহির্বাংলাদেশ ছুটি দেওয়া হোক নয় আমার ইস্তফাপত্র গ্রহণ করা হোক। এটিরও কোনও উত্তর নেই। অতঃপর আমি স্বাস্থ্য ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলব বলে স্থির করি। কিন্তু লক্ষ করি তাদের সঙ্গে দেখা করতে আমার সামনে প্রবল প্রতিবন্ধক উপস্থিত। অনুমান করি, তারা আমার সঙ্গে দেখা করবেন না। কিন্তু কেন? এই অশোভন অসহযোগিতা? কেন একজন মানুষের নাগরিক অধিকার কেড়ে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকা সাড়াশব্দহীন? এর নাম কি গণতন্ত্র? আমাদের শখের গণতন্ত্র?

সরকারি অনুমতি নিয়ে দেশের বাইরে যাওয়া কোনও সভ্য দেশের নিয়ম নয়। এই দেশের এই নিয়মটি যেন কেন করে বোধহয় বেঁচে আছে। যেনতেন বলছি এইজন্য যে দেশের নিরানব্বই ভাগ সরকারি কর্মচারি বা কর্মকর্তা সরকারি অনুমতি ছাড়াই দেশত্যাগ করেন। এটি আমাদের ইমিগ্রেশান জানেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও ভাল জানেন।

আমি যে পরিচয় নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছিলাম, সে কোনও চিকিৎসকের পরিচয় নয়, কবির পরিচয়ে, কবিতা পড়তে। ওখানে অপেক্ষমাণ মানুষ ছিল আমার সাংবাদিকতাধর্মী গ্রন্থ 'নির্বাচিত কলাম'-এর পাঠক। সুতরাং আমার সাংবাদিক পরিচয়টি একেবারে ফেলে দেওয়ার মত নয়।

যদি সাংবাদিক পরিচয় দেওয়ায় এবং সরকারি অনুমতি না নেওয়ায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েই থাকেন যে আমার অপরাধ হয়েছে তবে তার শাস্তিই বা এখনও দিচ্ছেন না কেন? আমার কোনও অপরাধ হয়েছে বলে আমি তো মনে করছি না। কবি বা সাংবাদিক হিসেবে দেশের বাইরে কোনও অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গেলে যে সরকারের অনুমতি লাগে তা আমার জানাই ছিল না। এখন আমার অপরাধ জোর করে খুঁচিয়ে বার করে আমার কী শাস্তি দেবেন, দিন। কিন্তু তার আগে আমার বৈধ পাসপোর্টটি তো ফেরত দেবেন, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? আমার নাগরিক অধিকার তো দেবেন। আর তা কবে দেবেন—তা জানবার অধিকারও নিশ্চয় আমার আছে।

'কতবার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাবে ধান?'

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান—এই শব্দ তিনটি একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়, কারণ সভ্য মানুষের জন্য সবার আগে এই তিনটি জিনিসই প্রয়োজন। কেবল অন্ন হলে চলে না, বাসস্থান হলেই হয় না, বস্ত্রের প্রয়োজন হয়। এদেশের কিছু মানুষ নিজেদের সভ্য বলে দাবি করে, যদিও তাদের ঘরের দুয়োরে বস্ত্রহীন বালক এসে ভিক্ষে করে। তারা নিজেদের অবলীলায় সভ্য বলে, যদিও তাদের চোখের সামনে উদ্বাস্তু উন্মূল মানুষেরা শুয়ে থাকে ফুটপাতে, রাতের রাস্তায়—তারা যখন উদর পূর্তি করে রকমারি ভোজে, কাছেই হয়ত ক্ষুধায় কাতরায় কোনও শীর্ণ ভিখিরি। আমি কী করে সভ্য বলবো এদের, এই দুর্ভাগাদের। গোগ্রাসে এদের এক খাবার খেতে দেখে পৃথিবীর আদিম অসভ্য মানুষের কথা মনে পড়ে। আমি ধারণা করি এরাই দেশের সবচেয়ে অসভ্য মানুষ, যারা কিলবিল করা অন্ন বস্ত্র ঘরহীন মানুষের ফাঁক-ফোকর দিয়ে যায় পরে আর অট্টালিকা গড়ে।

এই মুসলমানের দেশে মেয়েদের লেখাপড়া করবার নিয়ম ছিল না। কায়দা সিফারা পড়িয়ে তাদের বিদ্বান (!) বানানো হত। যুগের পর যুগ গেল, সেটুকু না হলেই নয় সেটুকু উত্তরণই কেবল হল। মেয়েরা এখন কায়দা-সিফারার পাশাপাশি বাংলা অংক ইংরেজি শিখছে। কিন্তু শিখে কী লাভ যদি তাকে চুলোয় হাঁড়ি ঠেলতেই হয়। যদি তার বিদ্যাকে কাজে খাটিয়ে দিতে বাধা পেতে হয়, সমাজের রক্তচক্ষু মানুষের বাধা! আর তখনই কি দরকার নয় সব বাধা ডিঙিয়ে যাবার তার অমিত সাহস এবং শক্তির? যদি মুখ থুবড়েই তাকে পড়তে হয় তবে ধিক তার শিক্ষায়, ধিক তার শিক্ষিত হবার ব্যর্থ সাধনায়। এই শহরে, শুধু এই শহরেই বা বলি কেন, দেশের অনেক শহরে মেয়েরা লেখাপড়া শেষ করে কাজ করতে নামছে—মাস মাস বেতন পায় কিন্তু শেষ অবধি কাজ বা চাকরিটি তারা চালিয়ে যেতে পারে না। যারা যখন চাকরিটি যেখানে হয়েছে, সেখানে বাস করবার মত তাদের নিজের বা আত্মীয়ের বাড়ি নেই। তবে কি তাদের অগত্যা ছেড়ে দিতে হবে কাজ? অগত্যা বাড়িতে বসে অপেক্ষা করতে হবে কবে একটি সুপাত্র এসে তাকে হাঁড়ি ঠেলতে নেবে? এমন ঘটনা কিন্তু ঘটছেই যে মেয়েরা নিজের শিক্ষা ও সচেতনতাকে সম্মান করে স্বনির্ভর হতে চায়, কিন্তু বাসস্থানের অভাবে তাদের পিছু হটতে হয়। বেইলি রোডে কর্মজীবী মেয়েদের একটি হোস্টেল আছে, সেখানে তিনবছর পর আর থাকতে দেওয়া হয় না। বলা হয় নতুন মেয়েদের সুযোগ দিতে হবে। সুযোগ দিতে গেলে কি পুরোনোদের তাড়িয়েই দিতে হয়? আর কোনও নিয়ম নেই। আর কোনও নির্মাণ? তিনবছর পর সে যাবে কোথায় যাকে তাড়ানো হয়? হোস্টেলগুলোয় বিয়েকেই একমাত্র গন্তব্য ধরে বসবাসের প্রেরণা দেওয়া হয়, অবিবাহিত মেয়েরা যেন চাকরির পাশাপাশি নিজের বিয়ের একটি সুরাহা করে ফেলে, একই রকম ডিভোর্সি মেয়েরাও বয়স থাকতে কারও সঙ্গে ঝুলে পড়ে। বারবার বুঝিয়ে দেওয়া হয় এখানের বাস সাময়িক বাস। কিন্তু কেন? কোনও মেয়ে যদি ভাবে এটিই তার গন্তব্য, সে কারও সঙ্গে ঝুলবে না, কারোর হাঁড়িও ঠেলবে না—সে

নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করবে, বাবা মা ভাই বোনের সংসারে বোঝা হবার ইচ্ছেও তার নেই—তবে? তার কি অধিকার নেই এই চিন্তা স্বপ্ন লালন করবার? তার কি অধিকার নেই স্বাধীন বসবাসের? অনেকে বলতে পারে বাড়ি ভাড়া করে নিলেই হয়। আমার এতেও আপত্তি নেই যদি কোনও মেয়েকে নির্দ্বিধায় বাড়ি ভাড়া দেয় বাড়িঅলারা, একজন পোষাতে না পারলে কয়েকজন মেয়ে মিলে একটি বাড়ি অনায়াসে ভাড়া নিতে পারে। বাড়িঅলা মেয়েদের বাড়ি ভাড়া দেয় না, যুক্তি টানে ছেলেরা এসে ঝামেলা করবে। এমনই এক জীব এই 'মেয়েমানুষ'—তাকে পেলেও লোকে ঝামেলা করে, না পেলেও করে। মেয়েদের যদি এই দেশের নাগরিক বলে ধরা হয় (অন্তত কাগজপত্রে তো ধরা হয়) তবে তার অধিকার আছে একা কারও দোসর না হয়ে বাড়ি ভাড়া পাবার। ছেলেরা মেসে থাকে। মেয়েরাও একই রকম মেস গড়ে নিতে পারে। বাসস্থানের অভাবে এই শহরের চাকরি ছেড়ে চলে গেছে অনেক প্রতিভাবান মেয়ে, গ্রামে বা মফস্বলের গৃহে বসে বেকার জীবন (মেয়েদের কাজহীন ঘরে বসে থাকাকে বেকার জীবন বলা হয় না, যেন ছেলেরাই বেকার হয়) যাপন করছে, কেউ হয়ত হতাশায় পতিতা বৃত্তিকেই বেছে নিয়েছে, কেবল মাথা গুঁজবার একটি ঠাঁইয়ের জন্য অযোগ্য স্বামীর কাছে জীবন সঁপে দিয়েছে।

এই যে চরম এক স্বপ্ন ভঙ্গ—কে নেবে এর দায়! রাষ্ট্র যদি মেয়েদের শিক্ষা দেয় কিন্তু কাজ না দেয়, সমাজ যদি মেয়েদের কাজ দেয় কিন্তু বাসস্থান না দেয় তবে ফাঁকিবাজিটা স্পষ্টই ধরা পড়ে। মেয়েদের মূল্য দেবার নামে হচ্ছে এক ধরনের প্রতারণা, যেমন তোমাকে আমি কথা শেখালাম কিন্তু ভাষাটা কেড়ে নিলাম, তোমার পায়ের শেকল খুলে দিলাম কিন্তু পথ মেপে দিলাম।

সারা দেশে মেয়েদের কর্মজীবী হোস্টেল বাড়াতে হবে। সরকারি হোক, বেসরকারি হোক। মেয়েদের বাড়ি ভাড়া দিতে হবে নির্দ্বিধায়, নিশ্চিন্তে। একটি মেয়েও আর বেকার বসে থাকবে না। দেশের কোনও প্রতিষ্ঠান মেয়ে নিই না বলে পার পাবে না। মেয়েদের পরনির্ভর বানালে ইচ্ছে মতো লাথি-গুঁতো দেওয়া যায়, লাথি গুঁতো দেওয়ার মজা যেন ফসকে না যায় তাই রাষ্ট্র এবং সমাজের কলকাঠি যারা নাড়ে—তারা এমন ব্যবস্থা মোটে করতে চায় না যাতে করে মেয়েদের ঠিক মানুষের মত দেখতে লাগে, মানুষের মত মাথা উঁচু করে হাঁটে, জোরেসোরে কথা বলে—পারলে ধমকায়, একে তাকে তোয়াক্কা করে না, কেউ তার গালে চড় কষালে সেও উল্টে চড় কষাতে জানে। কিন্তু ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। ঘুঘু চিরকাই ধান খেয়ে যাবে—এ কী মানা যায়! ঘুঘু তাড়াবার ব্যবস্থাও একদিন হবে নিশ্চয়ই।

যায় যায় দিন, ঢাকা

গাছের ছায়ায় বসে দুপুরের খাবার খাচ্ছিল তিনজন শ্রমিক, ওরা খেয়েই আবার কাজে নামবে। সকাল আটটায় ওরা আসে, যায় সন্ধে ছটায়। ওরা মাথায় ঘোমটা দেয় না, পাঁচবেলা নামাজ পড়ে না, ওরা রোজাও রাখে না, কারণ ওদের কাজ করতে হয়, মাথায় সিমেন্ট বালুর টুকরি নিয়ে রাজমিস্ত্রির কাছে পৌঁছে দিতে হয়, কর্মঠ মানুষের আলাদা অবসর নেই আলাদা করবার জন্য ধর্মচর্চার। দিনে ওরা মাথাপিছু পঁয়ত্রিশ টাকা পায়। সেই টাকায় চাল ডাল কিনে অকর্মা অলস স্বামী এবং সন্তানদের খেতে দেয়। ওরা পেট পুরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আর শ্রমিকটি আধপেট খেয়ে পরদিন সকালে আবার কাজ করতে যাবার প্রস্তুতি নেয়।

এ তো নিয়মই, মানুষ হয়ে জন্মালে কোনও অলৌকিক শক্তি তো তাকে আর খাওয়ানো পরানোর দায়িত্ব নেবে না, নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। এই তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্যপীড়িত সমাজে মেয়েরা ঘরের শোভা হয়ে ঘরে বসে থাকে, শরীরে মেদ এবং আলস্যকে প্রশ্রয় দিয়ে তারা পুরুষ মানুষকে তুষ্ট ও তৃপ্ত করে, বিনিময়ে খেতে পরতে পায়—এই যখন দুরবস্থা চারদিকে, তখন মেয়েরা যদি শরীরের ঘাম ঝরিয়ে রোদে পুড়ে জলে ভিজে কিছু উপার্জন করে, তাদের প্রতি মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানাতে আর কেউ না পারুক, আমি পারি। কিন্তু শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে যে দৃশ্য আমাকে দেখতে হয়, আমি তাতে আহত হই। আমার হৃদয় চূর্ণ হয় এইসব বৈষম্য-ব্যবস্থায়। পুরুষ শ্রমিকেরা একই কাজ করে বরং অবসর বেশি ভোগ করে, মাঝে মধ্যেই বিড়ি ফোঁকার ছুটি নিয়ে পঁয়ত্রিশ টাকার চেয়ে বেশি পায়। নারী শ্রমিকদের এ নিয়ে তেমন ক্ষোভ নেই, কারণ তাদের মেনেই নিতে হয় এই বৈষম্য। বৈষম্য তো তারা জন্ম থেকে দেখছে, স্বামীর মুখে খাবার তুলে দিতে হয়, আবার সেই স্বামীরই কিল ঘুষি পিঠ পেতে বরণ করতে হয়—এই বৈষম্য যারা প্রতিদিন সহ্য করে তাদের কাছে তারা পঁয়ত্রিশ পাচ্ছে আর পুরুষেরা পঞ্চাশ পাচ্ছে কেন এ নিয়ে কোনও অভিযোগ থাকবার কথা নয়। তারা মুখ বুজে ঘরে যেমন লাথিঝাঁটা খায়, বাইরেও বেশি পরিশ্রমে কম পয়সার মার খায়।

কেবল মাটি কাটা, ইটভাঙা, মোটা বওয়া এসব কাজে কাজে মেয়েরা কম পয়সা পাচ্ছে তা নয়, গার্মেন্টসের মেয়েরাও কম পায় পুরুষের তুলনায়। গার্মেন্টস-এ একই কাজ করে একটি পুরুষ পায় বেশি। দিনে দু'শটি জামা সেলাই করে একটি মেয়ে পায় ন'শ, দিনে দু'শটি জামা সেলাই করে একটি পুরুষ পায় বারোশ। এই বৈষম্যের কারণ কি হতে পারে বলে মনে হয়? পুরুষ শ্রমিকটি কি সময় বেশি দেয়, না কি কাজ বেশি করে, না কি কাজ তার অধিক উন্নতমানের? এর কোনওটিই যদি ইতিবাচক না হয় তবে নিশ্চয়ই ধরে নিতে হয় যে একটি 'পুরুষাঙ্গের' দামই এই সমাজে সবচেয়ে বেশি। পুরুষাঙ্গ আছে বলেই তারা নারীর সমান অথবা তার চেয়ে কম পরিশ্রম বা কাজ করে নারীর তুলনায় পারিশ্রমিক বেশি পায়। পুরুষাঙ্গের পুজো করা মানুষের পুরোনো স্বভাব। সম্ভবত এই স্বভাব মানুষ ত্যাগ করতে

পারছে না বলে নানান রকম কায়দা করে, বেতনের বৈষম্য ঘটিয়ে তা বহাল রাখছে, এও এক ধরনের পুরুষালি।

মেয়েরা তো জীবনভর মার খেয়ে এসেছে তাই এখন ঘরের বাইরে বেরিয়ে দুটো পয়সার মুখ দেখে ওরা সব ভুলে যায়, প্রাণ খুলে হাসে। ওরা যে ঠকছে, ওরা যে ওদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, কোনও ওরা তা শব্দ করে না। কেন এসব বলতে মানা, এসব বললে লোকে ওদের ঘাড় ধরে আবার 'অন্দর মহলে' ঢুকিয়ে দেবে, ওরা যথারীতি চুপচাপ চুপচাপ একদিন মরে যাবে। তাই ওরা চুপ হয়ে থাকে, প্রতিবাদের নাম করে না।

কিন্তু কতদিন এইসব অনাচার ঘটবে? কতদিন সমাজের ধুরন্ধর পুরুষেরা মেয়েদের খাটিয়ে নেবে কিন্তু কোনও মূল্য দেবে না? সমাজে তো উঁচুতে বলতে ভাল কথার ছড়াছড়ি। রাজনৈতিক মঞ্চে ধনী জ্ঞানকাণ্ড পরে লোকেরা ভাল ভাল কথা বলে, পত্রপত্রিকা রেডিও টিভিতে ভাল ভাল কথা লেখা হয় বলা হয় মানুষের কী করে ভাল হবে, কী করে দেশের উন্নতি হবে—এই নিয়ে বুদ্ধিজীবী চিন্তাবিদদের কপালে ভাঁজ পড়ছে দিন দিন কিন্তু চোখের সামনে এই যে একদল পঁচিশ নিচ্ছে আর আরেকদল পঞ্চাশ নিচ্ছে এই সমস্যার কথা তো কোথাও বলা হচ্ছে না, না কি এ কোনও সমস্যা নয়, যেহেতু এ 'মেয়ে মানুষের' সমস্যা তাই একে সমস্যা ভাবা উচিত নয়? মেয়েদের সমস্যা এই সমাজে আলাদা কোনও সমস্যা বলে বিবেচিত হয় না, ভাবা হয় মেয়েরা তো সর্বংসহা মাটির মত, তাদের পক্ষে সবই সওয়া সম্ভব।

সবই সওয়া সম্ভব একথা ঠিক নয়। সইতে না পেরে কত মেয়ে বিষ খায়, গলায় দড়ি দেয়, শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বেলে দেয়, একদিন তো হতে পারে সইতে না পেরে নিজের গায়ে আগুন জ্বালাবার বদলে ওরা অন্য কোথাও আগুন জ্বেলে দিল কোনও বৈষম্যের শরীরে, শেকড়ে। তবে?

তবেই তো বৈষম্য ঘুচবে। সহজ নারীর বুকে যখন অনলের স্তূপ জমছে, তখন উসকে দিলেই হয় একবার। জগতে যদি মহাপাপ, একবার তো তাপে ও সন্তাপে নারীর নিদ্রা ভাঙা উচিত।

আমি সেই দিনের অপেক্ষায় আছি, নারী যেদিন মানুষে মানুষে যে পঁচিশ পঞ্চাশের বৈষম্য তা ঘোচাবে। আমি সেই দিনের অপেক্ষায় আছি নারী যেদিন জগতের কোনও নিষ্ঠুর পুরুষকে মনে মনেও আর ক্ষমা করবে না। আমি সেই দিনের অপেক্ষায় থাকি নারী যেদিন তার এক কণা প্রাপ্যেরও কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেবে। কোনও ফাঁক এবং ফাঁকিকে সে কখনও ক্ষমা করবে না। পাঠক, সেই দিন কি খুব বেশি দূরে?

যায় যায় দিন, ঢাকা

যায় যায় দিনের সম্পাদক শফিক রেহমান তাঁর পত্রিকায় কোনও রচনা বা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মেয়েদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করবার কথা ভাবছেন। পাঠক নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন, এই কঠিন সিদ্ধান্ত কী করে নিতে পারেন নারী পুরুষের সমতায় বিশ্বাসী একজন আধুনিক মানুষ! আমিও অবাক হয়েছিলাম। তাঁর কাছেই জিজ্ঞেস করেছিলাম সিদ্ধান্ত নেবার কারণ। তিনি বললেন—পুরস্কৃত প্রতিযোগিনীর আজ গ্রীস যাবার কথা, সে যাচ্ছে না। সে যাচ্ছে না মানে সে যেতে পারছে না তাকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

পাঠক নিশ্চয়ই ভুলে যাননি গত ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে 'যায় যায় দিন'। গ্রীসে আড়াই হাজার বছরের গণতন্ত্র পূর্তি উৎসব উপলক্ষে গ্রীস সরকারের একটি সংস্থা 'কমিটি ফর ডেমোক্রেসি ২৫০০' বিশ্বের পনেরোটি পত্রিকার মাধ্যমে 'গণতন্ত্র এথেন্স, বাংলা' রচনায় প্রতিযোগিতায় যে বিজয়ী হবে তাকে দিচ্ছে গ্রীসের রিটার্ন টিকিট, সেই সঙ্গে বারো দিনের গ্রীস সফর। নিঃসন্দেহে পুরস্কারটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। গ্রীসের রাষ্ট্রীয় অতিথি হবার সম্মান যে কেউ হুট করে পেতে পারে না। 'যায় যায় দিন' এর মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতার ফলাফল জানানো হয়। 'আম্বিয়া আকতার' নামের এক মেয়ে বিজয়ী হয়েছে। থ্রি চিয়ার্স ফর আম্বিয়া আকতার।

কিন্তু থ্রি চিয়ার্সের সম্মান আম্বিয়া রাখতে পারেনি। তার রাখা সম্ভব হয়নি। অথবা তাকে রাখতে দেওয়া হয়নি। আজ প্রথম জুলাই তার গ্রীসের উদ্দেশে যাত্রা করবার কথা। সে যাচ্ছে না। সে যে যাচ্ছে না এটিও সে জানাতে পারছে না। যায় যায় দিন থেকে তাকে চিঠি দেওয়া হয়েছে টিকিট নেবার জন্য, সে চিঠির উত্তর আম্বিয়া দেয়নি, দিতে পারেনি। লোক পাঠানো হয়েছে তার বাড়িতে, তারপরও আম্বিয়া যোগাযোগ করেনি, যোগাযোগ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বারবার খবর দেবার পরও আম্বিয়া নিরুত্তর। যে মেয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে, সে গ্রীস না যাবার উদ্দেশ্যে নিশ্চয় করেনি। সে যেতে চাইবে না কেন, গ্রীসের রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণ সে তার প্রতিভার জোরে পেয়েছে, কেউ তাকে দয়া দেয়নি। তার না যাবার কোনও কারণ থাকবার কথা নয়।

গত বারোই এপ্রিল আম্বিয়ার বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে সে গ্রীস যাওয়া প্রসঙ্গে কোনও রা শব্দ করেনি। আমরা অনুমান করতে পারি তার স্বামী তাকে বাধা দিচ্ছে। এছাড়া আর কী কারণ গ্রীসের আমন্ত্রণ ছুঁড়ে ফেলবার। এছাড়া আর কী এমন ভয়ংকর ঘটনা তার জীবনে ঘটতে পারে যে সে তার হাতের মুঠোর পুরস্কার আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেবে। আমরা বুঝি, আমরা যারা এই দেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার শিকার, অনুমান করতে পারি আম্বিয়ার স্বামী আম্বিয়াকে ঘরে বন্দি করেছে। সে 'স্বামীত্ব' ফলাচ্ছে এই বলে যে তুমি আমার বন্দিত্ব ঘুচিয়ে বাইরে কোথাও যেতে পারবে না। আম্বিয়াও পালন করছে স্বামীর 'আদেশ'।

স্বামীটি যশোর জেলার সাবজজ। সে তার স্ত্রীকে যদি ঘর থেকে বেরোতে না দেয়, তবে কার সাধ্য আছে স্ত্রীকে বের করবার? সে তার স্ত্রীকে ঘরে বন্দি করে পেটাবে, কার সাধ্য আছে বাধা দেবার? আম্বিয়ার সাধ্য নেই গ্রীস যাবার। তার সাধ্য নেই স্বামীর আদেশ উপেক্ষা করে

নিজের অজ্ঞাতে পুরুষালী হয়ে ওঠায়। অথচ তাকে সম্বোধন টিকই থাকছে হয়তো তাকে মেয়ে হয়ে হয়ে। তার মেয়েরা কবিতা বলতে বলতে হয় না। কবি যা হয়ে, তাই শোনে। কবি যা দেয়, তাই খায়। কবিতার লাগে কবিতা বলা হলে, গৃহিণীরা বলছে, কবিতা বলা শেষে। কবি ছাড়া তেমন কবি নেই, কবি ছাড়া মেয়েদের কথা নেই তেমন। কবিতার কাছে টানের ওঠে কবিতা অবশ্যটিই প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে হয়ে সে টান থাকে না। আপাতত এই আমাদের কাজ।

কিন্তু কী তেন মনের মত হাসিকে কবিতা টানি দেখাবে! কবিতা এখনো রাজপুতনী মেয়ে, যার তেন হয় দেখাতে হক হয়ে থাকে হয়ে। সে মেয়ে পাওয়া এখনো, হাজার তাদন নিয়ে প্রথম হয়, সে মেয়ে কী করে মেনে মেয়ে সাধারণ-চৈতন্যকে সে মেয়ে কী করে মেনে মেয়ে স্বভাবের কাব্যসম্ভাবিক কাজের পাশাপাশি এই মেয়েরা মেয়ে কবিতা হাসে নিয়ে পুরুষের পেয়েছে, চিরদিন নিয়েছে। কবিতা পিয়ের কাছে। নিয়ের পড়া হয়ে পাশে কবি নিশ্চয়ই সম্ভব হয়ে না হাসে লেখে, নিয়েই কবা। এ কিসে তুমি কিন এবং, সেই কিন কবি নিয়ে তেন—এই পুরু কবিতা। কবিতা কবিতাকে নিয়েছিল হাসি সে কাছে, কী হয়ে? সাধারণ টিকিনে না এই মেয়ে সে তেন একটা প্রতিবেদন মেয়েরা পড়ে হয় কবি কবিতাকে কাজনে পুরিয়ে তেলাকে পাবে, সে তেন একটা সম্ভাবনার তবে কাব্যপুরুষ কাজে পাবে—তবে সঙ্গে সাধারণ টিকিনে তেনে কী লাভ কবিতার? এমন সাধারণ তেন টিকিনে হাসাকে হয় সুন্দর শিক্ষিত মেয়েরা।

কবিতার জন্য কবিতা সুন্দর হয়। যার তেমন মেয়েদের এ পড়া সুন্দরে মেয়েরা জন্য কবিতা কবিতা হয়। কবি জানি কবিতা এক নয়, এবং পড় কবিতা, সবার কবিতা হয়ে পড়া হাসি হয়ে থাকে। তবে হয়তো সবার তেন প্রতিভা পাবার বিচার করে নির্ধারণ নিয়ে সম্ভাই বড় সাজে। কী লাভ হয় পুরুষের মাঝেন চলন তোলাও হয়। মেয়েরা কী কবিতা করে? না মনুষ্যের কাব্য?

সেই সাধারণ সাজেনী ছুঁয়ে যাবে হক করে নী হবন ভুল হাসি হাসছে, পাঠক একবার অনুমান করুন। ছুঁয়ে কবিনেতা হাসি এই তার কবিতা বিচার, তাকে তার মনুষ্যের হাসি কী বিচার করবে তন কবিতাকে সে পাঠিয়ে দেয়েরে? তাকে নিয়ে এই তেন কী ভাবেই তেমন সাধা আশা করতে পারে!

যার তন সেই কবিতা। তন তবাবেন পড়াশোন তবা মেয়েরা, যারা নির্বিবাদে মেনে নেয় কবির সৌজন্যিক ব্যবহার কবি তবন নিশ্চয়ে হাকরের তেয়ে পুরুষের সাকরাবেই ব্যবহার হবে নাই।

কবি সেই পুরুষকে খুব তো কবিই যার কাছে নর কাব তিনি খুঁজে ভুল নির্বাচন করে, পাত্র পেয়ে পাত্র, কিন্তু যেই তবন মেয়েদের খুব তব কবি না যার পুরুষের এই কবিতার জীবনে মেনে নেয়, পাত্রের পেশাকে ভালো জন করে। সেই নাটাই মনুষ্যত্বের কাব্যজন পড়তে বেশি পাত্র যে হয় নিজের সম্ভাবনে কবিতা কাছে সম্ভব নেয়, সিদ্ধি করে।

কবিতাকে তবা কাছে বাব রবি কবি। যে কবি তার জীবনে টিকিন খুঁজে তেলাকে পাবে, সেই কবিতা কবিতাকে খুঁজে তেলাকে যে মেয়ে পাত্র না হাকে খুব কাছে আমার এতটুকু হাকে না। তুক কবিতাকের কাছে হয় জীবন কবে যে নাটি, সে নিজের তেয়ে কবিতাকে কবেই, আমার ইচ্ছার নাটাই সাধনেশ তে কবে। পাঠক, জীবনে টিকিন শুধু কথা নয়, শুধু কথা চরিত্রকে। নিজের ব্যক্তিকে, নিজের কবিতার তেমন কথা তেলাকে ভুল কথা।

কবি নাটাই নিরাপত্তা নেই, পাত্রে পাত্রে কবিতে কাছে চাঁদুনো কথনো। তবু এই মাথা কাছে পথ কবাকে হয়ে, এই মাথা কাছে তেলাকে মেয়েরা কাছে হয়ে হয়ে কবাকে। কবাকবে পড় হয়ে যে হয়ে সাধনে সেই কবাব কাছের পুরিবী। সেই পুরিবীকে পাবার তবা কবিতারা তবি প্রবন্ধ প্রভুর না হয় তবে কবে প্রভুর হয়ে! তিন কী কবার কাপড় কাছে কাছে। নাটাই পাত্রে তেমন পাত্রেল তব সহজ, সাধনের পাত্রে তেমন পাত্রেল তব সহজ নয়। কবি যে সময় বাস্তে-কাজ সাধনের পুরুষকাপের কাছে বাজা না পাত্র কবিতাদের প্রবন্ধ তেমন তেমে প্রেমে বাজা টিকিন।

পাঠক, আসুন নির্বাচন কবিতাদের তবা অবজা কবাকবে নির্বাচনের হাব প্রবর্তিত করি।

নারী তুমি কার?
তোমার না তার?

১.
লিফটে মেয়ে উঠলে লিফটম্যান মেয়েদের একটি কোণা দেখিয়ে বলে—'এখানে দাঁড়ান।' কোণায় দাঁড়াতে বলে, কারণ পুরুষেরা যেন মেয়েদের গা ঘেঁষে না দাঁড়ায়। গা ঘেঁষে দাঁড়ালে তারা ফাঁক ফোকর আর ঠেলাঠেলির সুযোগ নিয়ে মেয়েদের গায়ে হাত বাড়ায়। কেবল হাতই নয়, তারা আবার চাপ সৃষ্টিও করে। পুরুষের চাপের আবার নানান রকম আছে। তারা তাদের হাতের কনুই, বাহু, ঊরু, পায়ের পাতা, বুক, নিতম্ব ঠেসে ধরে মেয়েদের গায়ে। লিফটম্যান পুরুষ, সে ভাল জানে পুরুষের স্বভাবচরিত্র। সাপ যেমন জানে সাপের ফণা কাকে বেশি ছোবল দিতে ভালবাসে।

২.
বাসে উঠলেও একটি একলা মেয়ে দেখলে কনডাক্টর কোনও মেয়ের পাশে মেয়েকে বসায়, মেয়ে না পাওয়া গেলে বুড়ো পুরুষের পাশে, বড়জোর বাচ্চা কোনও ছেলের পাশে। কনডাক্টর [illegible] পুরুষ, সেও জানে পুরুষের স্বভাব। তাই সে অথর্ব বা অপ্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের পাশে মেয়েদের বসিয়ে স্বস্তি পায়।

৩.
অবিজ্ঞান মানুষকে ধ্বংস করে, জানি। কিন্তু বিজ্ঞান যাঁরা শেখায়, তাঁরাও আজকাল নতুন প্রজন্মকে ধ্বংস করতে নেমেছেন। জগন্নাথ কলেজের কেমিস্ট্রির প্রফেসর নুরুল হক তাঁর ছাত্রছাত্রীদের ধাতুবিদ্যা পড়াতে গিয়ে বলেন—'বিবাহিত হিন্দু মেয়েরা কপালে সিঁদুর পরে, সিঁদুর হচ্ছে রেড লেড (ট্রাইপ্লামবিক টেট্রাক্সাইড), আর মুসলমান মেয়েরা বিয়ের পর পরে সোনার গয়না। এর কারণ, মেয়েদের শরীর থেকে এক ধরনের বদ গ্যাস বেরোয়, এই গ্যাস স্বামীর অমঙ্গল করে। লেড এবং গোল্ড এই গ্যাসকে এবসর্ব করে নেয়, তাই মেয়েদের ওসব পড়তে হয়। মূলত স্বামীর মঙ্গলের জন্যই মেয়েদের ধাতু পড়তে হয়।' কিন্তু মেয়েদের শরীর থেকে বের হওয়া বদ গ্যাসটির নাম কি, আমি তো শরীর বিদ্যা ঘেঁটে এমন কোনও গ্যাসের খোঁজ পাইনি, যে গ্যাস কেবল মেয়েদের শরীর থেকে নির্গত হয়, পুরুষের শরীর থেকে নয়! কেমিস্ট্রির প্রফেসর কি বিজ্ঞানের ফাঁকে ফাঁকে অবিজ্ঞান শিক্ষা দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন? তা না হলে স্বামীর মঙ্গলের জন্য মেয়েদের যে ত্যাগী হতে হয় এই আদিম ও অসভ্য শিক্ষা তিনি বিতরণ করেছেন কেন!
এইসব বদ শিক্ষকেরা বদ গ্যাসের প্রচার করে ছাত্রছাত্রীদের বদ বানাবার চেষ্টায় রত। অলৌকিক অমঙ্গল টেনে তাঁরা লৌকিক মঙ্গলকে কাফন করে দূরে সরিয়ে রাখেন আর একটু একটু করে বিষ ঢুকিয়ে দেন মেধাবী প্রজন্মের মস্তিষ্কে।

৪.
হোন্ডার পেছনের সিটে মেয়েরা একপাশে পা ঝুলিয়ে বসে। দুদিকে পা রেখে বসলে কিছু কি ক্ষতি হয়? নিশ্চয়ই নয়, বরং যে কোনও দুর্ঘটনা থেকে তারা বাঁচে বৈকি। কিন্তু দু পা জড়ো

করে রাখবার এই নিয়ম কোত্থেকে এল? এও কি আমাদের পেছানো সমাজ থেকে, যে সমাজে মেয়েদের জড়সড় হয়ে থাকতে হয়, দু'পা-দু'হাত-দু'বাহু প্রসারিত করতে মানা যাদের। যে সমাজে মেয়েরা যত বেশি সিঁটিয়ে থাকবে, তত বাহবা জুটবে তাদের। তাই বুঝি এই বাহবা পাওয়ার লোভে একটি আধুনিক যান ব্যবহার করেও তাকে এই জড়সড় ভঙ্গিটি বজায় রাখতে হয়।

৫.
এক যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। পরিচয়ের তিনদিনের দিন প্রচার হয়ে গেল তার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে, পাঁচদিনের দিন প্রচার হল একটি বাচ্চাও হয়েছে আমাদের। লোকের ভাবনার ইলাস্টিসিটি দেখে আমি মুগ্ধ হই। সম্ভবত স্ত্রী এবং পতিতার বাইরে পুরুষেরা কোনও মেয়েকে খুব কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পায় না বলে অন্য কোনও মেয়ে দেখলে চোখের জুলজুল দৃষ্টি আর সরে না। তারা বাধভাঙা লোভে মেয়েদের নিয়ে কাহিনী বানায়, যে কাহিনী চায়ের টেবিলে তাদের হাসির যোগান দেয়। মেয়েদের নিয়ে যত রস রসিকতা ছেলেরা করে মেয়েরা কি তার সহস্র ভাগের একভাগ করে?

৬.
বাজারে পাকিস্তানি বোরখার এখন কদর বেশ। মেয়েদের সারাশরীর ঢাকবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এদিকে সিনেমা হলের বিলবোর্ডে মেয়েদের যে শরীর আঁকা হয়, যে শরীরগুলোয় সুচালো বুক এঁকে পথচারিকে প্রলোভ করা হয় ছবিঘরে যাবার, সেসব দেখে ধর্মপ্রাণ মানুষ কেন রুখে দাঁড়ান না? অন্তত যাঁরা মেয়েদের শ্লীলতা রক্ষা করবার জন্য জীবনপাত করছেন! এ বিষয়ে বিলবোর্ডের দিকে শায়খুল হাদিসই বা কেন এখনও লং মার্চ করছেন না?

৭.
রিক্সার হুড তুলে একটি ছেলে চলতে পারে, মেয়ে নয়। একা একটি মেয়ে রিক্সার হুড তুললে নাকি দৃশ্যটি শোভন হয় না। এও মেয়েদের ওপর আরেক ধরনের পর্দা প্রথা। ঢাকা শহরে হঠাৎ হঠাৎ কিছু মেয়েকে দেখা যায় পর্দা ফেলতে, মফস্বলে সম্ভব নয়। মেয়েদের গায়ে তো পর্দা চড়াতেই হয়, স্ত্রীলিঙ্গ যানবাহনও পর্দার ঊর্ধ্বে নয়, যানের পর্দা তার মাথায় তুলতে হয়। বাসেও আলাদা করে বসবার জায়গা থাকে মেয়েদের জন্য। কেবল যানবাহনের নয়, রেস্তোরাঁয় পর্দা ঘেরা কেবিন থাকে—কেবিনগুলো ওপর লেখা থাকে—মহিলা। মেয়েদের ঢেকে রাখবার আয়োজন সমাজের সর্বত্র। খাবার জিনিস যেমন ঢেকে রাখতে হয়, মাছি যেন না বসে; মেয়েদের গায়েও তেমনি ধুলো দেয় না কেউ, মাছি বসতে, বাসি হতে দিতে চায় না, ঢেকে রাখে, ফ্রিজে রাখে, উনুনে চড়ায়, তারপর পরিবেশন করে।

৮.
প্রেম প্রেমই। এর আগে পরে 'পরকিয়া' বা 'আপনকিয়া' শব্দ ব্যবহার করলে প্রেমের মহিমাই নষ্ট হয়। ম্যাজিস্ট্রেট শাহিদা পরকীয়া প্রেম করত এবং সন্তানটি তার স্বামীর ঔরসজাত নয়, এ নিয়ে প্রেস এখন মুখর। প্রেম সে করতেই পারে, স্বামীর যদি স্পার্মলেস সিমেন থাকে অথবা সে উত্থানরহিত হয়, স্ত্রী তার প্রেমিকের সন্তান গর্ভে নিতেই পারে, মানুষ তার মনে এবং শরীরে কাকে বহন করবে বা না করবে সে একান্তই তার ব্যাপার। শাহিদার প্রেম নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা মানে তার ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা। অবশ্য [illegible] মেয়েদেরই যেখানে স্বাধীনতা নেই, সেখানে মৃত মেয়ের আবার স্বাধীনতা কী!

বিরানব্বই-এর তেইশে সেপ্টেম্বর ভোরে টর্চ জ্বালিয়ে কলকাতার ফুলবাগানে ঘুমন্ত এক ফুটপাতবাসিনীকে জোর করে পুলিশ-ভ্যানে তুলে থানার ব্যারাকে নিয়ে যায় নীলকমল, সনাতন এবং ভোলানাথ। থানার দোতলায় ওই পুলিশ ব্যারাকে নিয়ে মুখে কাপড় বেঁধে ওরা মেয়েটিকে ধর্ষণ করে। এক সময় মুখের কাপড় সরে যাওয়ায় মেয়েটি চিৎকার করে ওঠে। তাতে পাশেই ঘুমন্ত তিন কনস্টেবল জেগে ওঠে। জেগে উঠে সাহায্য করবার বদলে ওরাও ওই মেয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘটনার পর মেয়ে ফিরে যায় ফুটপাতে, ওখানে কিছু লোক সঙ্গে নিয়ে থানায় যায়, ওসিকে জানায়। ওসি পুলিশ কমিশনারকে জানালে কমিশনার নিজে থানায় গিয়ে পাঁচজন কনস্টেবল এবং পুলিশের এক গাড়িচালককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে, গ্রেফতার করে, সেই সঙ্গে সাসপেন্ড করা হয় থানার ডিউটি অফিসারকে, ওসিকে বদলি করা হয় রিজার্ভ ফোর্সে। এই ধর্ষণের ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়। কলকাতা শহরের রাস্তাঘাটে পুলিশের গায়ে থুতু দিতে থাকে পথচারিরা, কিছু জায়গায় ট্রাফিক কনস্টেবলদের মারধরও করা হয়। বছর গড়িয়ে যায় হল....পুলিশ কনস্টেবল নীলকমলের যাবজ্জীবন।

কলকাতায় ধর্ষণের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে গেল একজন পুলিশ কনস্টেবলের। রায়ের দিন জজ বলেছেন, 'এই ঘটনা ঘটেছে থানার ভেতরে, যে জায়গাটা সাধারণ মানুষের কাছে সবচেয়ে নিরাপদ বলে পরিচিত। এই ঘটনা মনে করিয়ে দেয় আলবার্তো মোরাভিয়ার বিখ্যাত উপন্যাস 'টু ওমেন' এর কথা, যেখানে গির্জার মধ্যে এক কিশোরিকে ধর্ষণ করেছিল সৈনিকরা।' নীলকমল কাঁদছিল, কিন্তু তার কান্নার কারও মন গলেনি। যাবজ্জীবন হয়ে গেছে নীলকমলের, সে এখন কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে। আচ্ছা, এরকম ঘটনা কি আমাদের দেশে কল্পনা করা যায়? ফুটপাতের কোন মেয়েকে যদি কেউ ধর্ষণ করে তার কি একদিনের জেলও হবে? সেদিন পটুয়াখালি থেকে ঢাকা আসবার পথে লঞ্চে এক মেয়েকে ধর্ষণ করে কর্তব্যরত আনসাররা। জেলা এডজুডেন্ট খবর পেয়ে আনসারদের সাসপেন্ড করেন। কিন্তু শেষ অব্দি ব্যাপারটিকে আনসারদের পক্ষে নিয়ে বলা হয় ওই মেয়ে পতিতা ছিল। যেন পতিতা ছিল বলে আনসাররা তাকে ধর্ষণ করবার দাবি রাখে। পতিতা ছিল বলে আনসারদের সাতখুন মাপ। এখানে ফুটপাতবাসি হলে এরকমই অবস্থা হত, বলা হত ফুটপাতে পড়ে থাকা মেয়েকে ধর্ষণ করা এমন কোনও অন্যায়ের বিষয় নয়। আমার জানা হয়ে গেছে, বোঝা হয়ে গেছে সব। ধর্ষণ এখন পুরুষদের কাছে ডাল ভাত। কে যেন একজন বলেছিল 'সব পুরুষই মনে মনে যে কোনও মেয়েকে ধর্ষণ করে।' কথাটিতে আপত্তি করতে ইচ্ছে করে আমার, পারি না।

মেডিক্যাল কলেজের থার্ডইয়ারে ধর্ষণের সংজ্ঞা শিখিয়েছিলেন জুরিসপ্রুডেন্সের টিচার। আমাদের মুখস্ত করতে হয়েছে সংজ্ঞাটি, ক. ষোল বছরের কম বয়সী মেয়ের অনুমতি নিয়ে অথবা না নিয়ে, খ. পনেরো বছর কম বয়সী স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে, গ. পনেরো বছরের বেশী বয়সী স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া ঘ. ষোল বছরের বেশি বয়সী স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া এবং ঙ. ভয় দেখিয়ে, মাদক দ্রব্য খাইয়ে, মিথ্যে কথা বলে, জোর করে, ছদ্মবেশে এসে কোনও মেয়েকে এবং চ. কোনও পাগল বা বোকা মেয়েকে যদি যৌন সঙ্গম করা হয়, তবে তাকে ধর্ষণ বলে। অবশ্য যৌন সঙ্গম হতেই হবে এমন কোনও কারণ নেই, মেয়ের যৌনাঙ্গে পুরুষের যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলেও ধর্ষণ ঘটে। এই সংজ্ঞাটি ক'জন মানুষ জানে? অথবা জানলেও সে মত কি বিচার হয় কারও? নিশ্চয়ই হয় না। হাদিসে আছে, 'কোনও স্বামী যখনই তার স্ত্রীকে সম্ভোগের উদ্দেশ্যে আহবান করে তখনই সেই স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছে পৌঁছুতে হবে, তা না হলে

সারারাত ফেরেশতারা তাকে অভিশাপ দেবে।' স্বামী যদি প্রভু হয় এবং স্ত্রী যদি দাসি হয়, তবে হাদিসের কথাই শিরোধার্য। এবং তা না হলে ভূমিসক্রান্তের আধুনিক আইনটি মানুষের মানা উচিত। পতিতা বা ফুটপাতবাসিনী হলে আইন বদল হবার কথা নয়। কোথাও লেখা নেই পতিতা হলে ধর্ষণের শাস্তি কিছু কম। কলকাতায় ধর্ষণের শাস্তিকে যাবজ্জীবন পর্যন্ত গড়াতে সাহায্য করেছে রাজ্য সরকার। আমাদের দেশের সরকার কটি ধর্ষণের শাস্তি করেছে যাবজ্জীবন? বলতে দ্বিধা নেই একটিও নয়। ধর্ষণ ঘটলে এখনও এদেশে ধর্ষিতাকেই দোষী বলে ভাবা হয়। বলা হয় মেয়েটি প্রভোক করেছিল ধর্ষণ করতে; তার মিটিমিটি চোখে চাওয়া, অকারণ হাসি, উগ্র পোশাক সবই ধর্ষণের অনুকূলে ছিল। এসব যুক্তিকে সমাজে বেশ কদর করা হয়। একজন মেয়ে, তার যদি ইচ্ছে করে সে হাসবে, যেমন ইচ্ছে চলবে, হাসবে, যেমন খুশি তার পোশাক পরবে—এ কারণে তাকে ধর্ষিতা হতে হবে কেন? মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এইসব অনর্থক যুক্তি তো আছেই তার ওপর সাক্ষ্য প্রমাণের ঝামেলাও আছে, ধর্ষণ কেউ সাক্ষী রেখে করে না, অথচ সাক্ষী খোঁজা হয়, একজন মেয়ে যদি সাক্ষ্য দেয় হবে না, দুজন মেয়ে দরকার। যেখানে একজন পুরুষ হলেই চলে, সেখানে দুজন মেয়ে না হলে প্রমাণ হয় না। কারণ এদেশের আইনে দুই মেয়ে=এক ছেলে।

আমি জানি না স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে চাকরি করা গৌরি রাণীকে পরিচালকের গাড়ির ড্রাইভার এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা মিলে যে দুর্ধর্ষ ধর্ষণটি ঘটিয়েছিল, সেটির কোনও বিচার হয়েছিল কিনা, আর বিচার হলে কি ধরনের বিচার। নীলকমল কি কোনও উদাহরণ হতে পারে না? প্রেসিডেন্সি জেলে যে নীলকমল যাবজ্জীবন শাস্তি মাথায় নিয়ে বসে আছে সেরকম বিচার? চাই আমার এই দেশও কঠোর হোক ধর্ষণের বিচারে। চাই আমার দেশও লঞ্চের আনসারদের যাবজ্জীবন দিক। কেবল পুলিশে আর আনসারে যে ধর্ষক সংখ্যা বাড়ছে তা নয়, সমাজের সর্বত্র তা বাড়ছে।

আমি যৌন স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আর সব স্বাধীনতার মত মানুষের এই স্বাধীনতাও প্রয়োজন। কিন্তু জোর জবরদস্তি চলবে কেন? সে ভিখিরি হোক কি পতিতা হোক কি স্ত্রী হোক—সে যদি অনুমতি না দেয় কারও কি অধিকার আছে তাকে স্পর্শ করবার? আমার বিচারে নেই। রাষ্ট্রীয় বিচারে বারবারই ধর্ষকরা পার পেয়ে যায়। এতে রাষ্ট্রই নারীর নাগরিক অধিকারে ধুলো ছিটোয়। এরপরও এ দেশের নারীরা যদি মুখ ফুটে ধর্ষণের বিচার যাবজ্জীবন করবার জন্য আন্দোলন না করে, আমি তবে সেই নির্বোধ নারীদের বলতে বাধ্য হব, তারা বোধহয় মনে মনে ধর্ষিতা হতেই চায়।

[illegible], ঢাকা

ঘুঘুড়ে হলেও শুদ্ধ হয় না

১.

দুসংখ্যা আগে যায় যায় দিনে লিখেছিলাম....'বাসে উঠলেও একটি একলা মেয়ে দেখলে কনডাকটর কোনও মেয়ের পাশে মেয়েকে বসায়, মেয়ে না পাওয়া গেলে বুড়ো পুরুষের পাশে, বড় জোর বাচ্চা কোনও ছেলের পাশে। কনডাকটর নিজে পুরুষ, সেও জানে পুরুষের স্বভাব। তাই সে অথর্ব বা অপ্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের পাশে মেয়েদের বসিয়ে স্বস্তি পায়।

পুরোনো লেখা নতুন করে স্মরণ করবার কারণ হচ্ছে একটি চিঠি। চিঠি তো দিনে একশ'র ওপর আসে, সব চিঠি পড়বার সময়ও হয় না। হঠাৎ হঠাৎ কিছু চিঠি চমকে দেয়, কিছু চিঠি ভাবায়, কিছু আবার কাঁদায়ও। মৌ নামের এক মেয়ে কুমিল্লা থেকে আমাকে লিখেছে...

'আপনার চলতি সংখ্যার কলামের এক কোণে লেখা ছিল 'বুড়োরা অথর্ব'। এতে আমারও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমার অবুঝ বেলার ছোট্ট একটা ঘটনা আপনাকে জানাতে ইচ্ছে করছে—প্রতিকারের আশায় নয়, শুধু বলবার জন্যও মানুষের কেউ না কেউ তো থাকতেই হয়।

আমি তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। বুড়ো মতন এক লোক, দেখতে অনেকটা আবু ফয়জলের মত, এলেন আমাদের মফস্বলে—সেক্সপিয়ারের গল্প থেকে নৃত্যনাট্য করে ডোনেশন তুলতে। আমি ওতে একটা গানে অংশ নিয়েছিলাম। একদিন রিহার্সেলের পর রাতে জীপে করে সবাইকে পৌঁছে দিতে গিয়ে সবচেয়ে শেষে পৌঁছালেন আমাকে— সর্বকনিষ্ঠ বলে এবং সেই সুযোগে উনি আঙুল দিয়ে আমার যৌনাঙ্গে চাপ দিতে লাগলেন। আরো বেশি কিছু হবার আশঙ্কায় সে রাতে শুধু মুহূর্ত গুনেছি। কখন বাসার গেটটা চোখে পড়বে। পরের দিন বাসায় চলে এলেন ভাল করে গান শেখাতে। আমার মা ডিসটার্ব হবে ভেবে সে ঘরে আর এলেন না। উনি কিছুক্ষণ পর আমাকে বললেন—দাদু তোমার কাছে একটা ছোট্ট জিনিস চাইব, আমাকে ফিরিয়ে দিও না। এবং তারও অনেক পরে আতংকিত আমার দু'পা ফাঁক করে যৌনাঙ্গে একটা চুমু দিলেন।

তারপর অনেকগুলো দিন আমার শুধু পানিতে ডুবিয়ে রাখতে ইচ্ছে করতো নিজেকে। একথা আমি কাউকে বলিনি-বাবা, মা, বন্ধু, বান্ধবী কাউকে না, পাছে আমাকে সবাই অপবিত্র মনে করে।

এবং আজও পাকা দাড়ি দেখলে আমার বমি আসে, আমি সব সময় তাদের ছোঁয়া বাঁচাতে ব্যস্ত থাকি, পাছে আশীর্বাদ করার ছলে ওরা আমার মনে আরো ঘৃণার জন্ম দেয়। মনে মনে ভাবি যেন আমার শুধু শাশুড়ি থাকে, কোন ভদ্রবেশি শ্বশুর না থাকে। যখন বাসে চেপে কোথাও যাই শুধুই খুঁজি একজন যুবককে, কোন বৃদ্ধকে নয়। আমি লক্ষ করেছি যুবকেরা কিছুক্ষণ গল্প জমাবার চেষ্টা করে শেষে ক্ষান্ত দেয়, কিন্তু বুড়োরা কখনো ঘুমিয়ে, কখনো জেগে কেবলই শরীর চেপে বসে থাকে।

আপনি সেইসব ছোট্ট কিশোরীদের নিয়েও একটা কিছু লিখুন, যারা নিজেদের বাঁচাতে শেখেনি তথাকথিত 'দাদু'দের কবল থেকে।'

চিঠিটি পড়ে মনে মনে ক্ষমা চাইলাম মৌ এর কাছে। বুড়োদের অথর্ব বলা আমার উচিত হয়নি, আসলে পুরুষ পুরুষই, সে খোকা হোক কি বুড়ো হোক। কয়লা ধুলে যেমন ময়লা ওঠে না, পুরুষের চরিত্রও তেমন, ঘুঘুড়ে হলেও এটি শুদ্ধ হয় না।

২.

মেয়েরা পুরুষের তুলনায় ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে পারে এ কথা অনেকেই জানে। ঠান্ডা মাথায় যেহেতু তারা কাজ করে, তবে এই দেশে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে যে সড়ক দুর্ঘটনা সেটির হার আমি মনে করি কমে যাবে যদি মেয়েরা চালকের দায়িত্ব গ্রহণ করে। দু একটি এনজিও গাড়ির চালক হিসেবে মেয়েদের নিচ্ছে, কিন্তু এ তো আর যথেষ্ট নয়। সরকারি বাহনগুলোর, একই সঙ্গে বেসরকারি বাস-ট্রাকের চালক হিসেবে মেয়েদের নেবার ব্যবস্থা কি করা যায় না? কেবল তাই নয় প্রাইভেট কারগুলোর চালক হিসেবেও মেয়েরা আমার মনে হয় অধিক নিরাপদ। গাড়ির চালক হিসেবে মেয়েদের কাজে লাগানো শুরু হলে ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টারগুলোয় মেয়েরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ভর্তি হবে। এবং নিজেদের নিষ্ঠাবান, দায়িত্ববান, ধীর স্থির, দক্ষ চালক হিসেবে গড়ে তুলবে।

মেয়েদের এই দেশে বিজ্ঞাপনের মডেল করা হয়, কিন্তু সেলস গার্ল করা হয় না কেন বুঝি না। হিসেব নিকেশে, আমার মনে হয় প্রতিটি মানুষ স্বীকার করবে, মেয়েরা দক্ষ বেশি। উচ্ছৃঙ্খল মদ্যপ স্বামীর সংসার স্ত্রীকেই অত্যন্ত বুদ্ধি খাটিয়ে টিকিয়ে রাখতে হয়। থিওরিটিকাল সার্টিফিকেট মেয়েরা জোটাতে পারে না কারণ তাদের তো লেখাপড়া বেশিদূর করতে দেওয়া হয় না, কিন্তু প্র্যাকটিকালি প্রমাণ করছে তারা দশে দশ। মেয়েদের তবে সেলসগার্ল করবার যথেষ্ট কারণ আছে নিশ্চয়ই। ঢাকা শহর ছেয়ে গেছে মার্কেটে, মেয়েরা নেই বিক্রেতা হিসেবে। একটি দক্ষ শক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে না। কেন? অসংখ্য মেয়ে আজ বেকার। তারা কাজ না পেয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এত প্রতিভা মেধা শক্তি নষ্ট করবার অধিকার কি রাষ্ট্রের আছে?

গ্রামেও মেয়েরা ধান মাড়াইয়ের কাজ করছে, রাইস মিলগুলোয় কাজ করতে নেমে গেছে অনেক নিম্নবিত্ত মেয়ে। নিম্নবিত্তরা এরকম নেমে আসুক হাটে বাজারে, কল কারখানায়, তারা কৃষি কাজে ভাল, উৎপাদনে যত্নবান। সুতরাং নয় কেন? সূতিকা ঘরে বছর ভর শুয়ে থাকবার দিন কি এখনও শেষ হয়নি নারীর? তারা যদি হাঁস মুরগি পালতে পারে, তারা কেন মাঠে মাঠে শস্য ফলাতে পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। নিম্নবিত্ত থেকেই পরিবর্তন আনতে হবে, মধ্যবিত্তরা সুবিধাভোগী আর উচ্চবিত্ত এখানে ওটিক্য, এরা বড় কোনও পরিবর্তনের সহায়ক নয়। আমাদের উচিত শিক্ষা এবং বিজ্ঞান নিয়ে 'অধিকাংশের' দুয়ারে যাওয়া।

হাজ বাত দিন, ঢাকা

১.

আমার বাড়িতে টেলিভিশন সেট আছে একটি। যেটি সারা বছর বন্ধই থাকে। খোলা হয় কখনও সখনও ক্লাসিক ছবি দেখতে গিয়ে। সেদিন টেলিফোনে এক নারী কণ্ঠ আমাকে অনুনয় করল— 'আপনি কি টিভি সেটটি দয়া করে অন করবেন?' ভেবেছিলাম টিভিতে আমাকে গালাগাল দেওয়া হচ্ছে বোধহয়, নাগাড়ে গালাগাল দেওয়া হচ্ছে বোধহয়, নাগাড়ে গালাগাল তো দিচ্ছেই ইনকিলাবঅলারা, টিভি তো আর ইনকিলাব থেকে মেধায় এবং বিশ্বাসে উন্নত নয়, তাই হতেও পারে আমার মুণ্ডুপাত নিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় মাধ্যমটি এবার সরব হয়েছে। তো ধুলো পড়া নব চাপতেই তুমুল ঝগড়ার শব্দ আমাকে বিস্মিত করল। নর নারীরা ঝগড়ায় নেমেছেন। এককাপ গরম চা সামনে নিয়ে বসলাম, সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, মনে হয় আমার সৌভাগ্যই যে আমাকে বেশিক্ষণ বসতে হয়নি, অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল অর্থাৎ ঝগড়া থেমে গেল অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে। তরিকুল ইসলাম নামের মন্ত্রীটি খসখসে গলায় যা বলছিলেন, তা এত নির্বোধের মত কথা যে অবাক হচ্ছিলাম এই লোকটি কি করে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী হবার যোগ্যতা রাখেন। নারীর প্রতি যাঁর সামান্য শ্রদ্ধাবোধ নেই, নারীর মর্যাদা অমর্যাদা সম্পর্কে যাঁর বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই তিনি আর যে বিষয়ের মন্ত্রী হোন আমার আপত্তি নেই (এত আপত্তি করলে ঠগ বাছতে গা উজাড় হবে। শুদ্ধ মানুষ সমাজে দুচারটে মিললেও মন্ত্রিসভায় মেলা দুরূহ সম্ভবত অশুদ্ধ হওয়াই মন্ত্রী হওয়ার প্রধান গুণ।) কিন্তু নারী বিষয়ের মন্ত্রী কেন? মন্ত্রী বললেন বউ শাশুড়ি যেহেতু ঝগড়া করে, তাই নারীই নারীর শত্রু। দেশের চরম অশিক্ষিত মানুষগুলো এই নির্বোধ কথাগুলো বলে। মন্ত্রীও বললেন! কিন্তু এই সহজ কথা কি মাথায় ঢোকে না যে পরনির্ভর মানুষের নিয়মই এই, তারা নির্ভরতার খুঁটির জোর খাটাতে চায়। শাশুড়ি ছেলের জোরে কথা বলে, বউ করে স্বামীর জোরে। পুরুষ যার দিকে হেলে বেশি, সেদিকে, সে মা হোক বউ হোক, জোর বেশি থাকে। মূল জোরটা কিন্তু পুরুষের, নারীর নয়। অথচ নির্বোধের মত চেঁচালেন মন্ত্রী, এবং খুব মূল্যবান কথা বলেছেন ভেবে সম্ভবত তৃপ্তিও পেলেন, সেরকম একটি হাসি দেখেছি তার ঢুলুঢুলু চোখে, (বেশি তৃপ্তি পেলে কারও কারও চোখও হাসে।) কানাডায় নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে একথা বলে আরেকজন বোঝাতে চেয়েছেন যে উন্নত দেশেও যেহেতু নারী নির্যাতিত, এই অনুন্নত দেশেও নারী নির্যাতিত হতে অসুবিধে কী। হায় নির্বোধের দল! কানাডায় এ পর্যন্ত 'ভাল' যা যা ঘটেছে তা ধারণ করবার যোগ্যতা কি আছে এই সমাজের? তবে তার 'খারাপ'গুলো ধারণ করছি বলে আমরা কেন স্বস্তি পাব? নারী এদেশে মানুষেরই মর্যাদা পায় না, দেশে বিরাজ করছে নারীকে অমানুষ বানাবার আইন। সমাজে বিরাজ করছে নারীকে অপদস্থ করবার নিয়ম। পরিবারে বিরাজ করছে নারীকে দাসি করবার পদ্ধতি। সেখানে কানাডায় কোন নারী নির্যাতিত হল তা নিয়ে এখানকার পুরুষদের বগল বাজাবার কি আছে? নিজ দেশের অসুস্থতা নিয়ে, নিজ

দেশের অধঃপতন নিয়ে যার কোনও অভিযোগ নেই, নিজ দেশের নিরন্তর নারী নির্যাতন যাকে কাতর করে না, সে কি না করে কোন অসতর্ক মুহূর্তে সভ্য দেশগুলোর ত্রুটি ঘটবে তারই অপেক্ষায় থাকে, এবং সেই ত্রুটি উল্লেখ করেই নিজেদের অপকর্মের সান্ত্বনা খোঁজে — তার ধূর্ততা এবং একই সঙ্গে চরম মূর্খতার প্রতি করুণা করতে বড় ইচ্ছে জাগে আমার।

আরেকজন সম্ভবত বললেন— তাঁরা জানেন না, ইন্ডিয়ায় হিন্দুদের কী আইন, যে আইন দেখে এখানকার হিন্দু আইন তৈরি করতে হবে। আসলে আইন কখনও হিন্দু মুসলমান নিয়ে হওয়া উচিত নয়। আইন যদি সভ্য না হয়, মানুষ সভ্য হবে না। আইনের হিন্দুত্ব আর মুসলমানিত্ব মানা অসভ্যতা ছাড়া কিছু নয়। মানুষকে সভ্য করতে হলে একটি আধুনিক সভ্য আইনের প্রয়োজন। আর এদেশের অসভ্য, অসংস্কৃত, অনাধুনিক, অধম মানুষদের জন্য যত শিগ্গির সম্ভব কঠোর কঠিন আইন করা প্রয়োজন যে উত্তরাধিকার হোক, বিবাহ হোক, তালাক হোক, সন্তানের অধিকার হোক কোথাও নারী পুরুষে কোনও বৈষম্য থাকবে না। মানুষ হিসেবে সকলেই সমান হবে, সে বিশ্বাস হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, বৌদ্ধ কী খ্রিস্টান হোক।

২.

নতুন একটি কথা উঠেছে পুরুষের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা চতুর্থ বিবাহ করতে হলে আদালতের অনুমতি লাগবে। আগে স্ত্রীর অনুমতি লাগত। আর এখন আদালত থেকে অনুমতি নিতে হবে। এতে নারী কি লাভ হল শুনি! পুরুষের জন্য কি আদালত থেকে অনুমতি নেওয়া খুব দুরূহ কোনও কাজ যে এ কাজে তারা ভয় পাবে? আদালতও দুর্লভ নয়, আদালতের অনুমতিও দুর্লভ নয় এদেশে। কথা যখন উঠেছেই, পুরুষের শখের 'বহু বিবাহ' বন্ধ করবার কথা কেন ওঠে না? নাকি সাহস হয় না? পুরুষকে খানিকটা খুশি করে বিল পাশ না করলে বুঝি চলে না? যদি বিল পাশ করতেই হয়, তবে অনুমতির ঝামেলা বাদ দিয়ে 'বহু বিবাহ' নিষিদ্ধ করবার বিলই পাশ করতে হবে। এইসব খুচরো সংশোধন আমরা মানব না, আমূল সংশোধন চাই। আমূল বদল চাই এই ঘুণে ধরা সমাজটির। সভ্য আইন চাই, মানুষের আইন চাই; অসভ্যের নয়, অপমানের আইন আর নয়।

ভাতের খিদেকে একমুঠ মুড়ি মুড়কি দিয়ে মেটাতে চাইলে আমরা অনশন করব বলে দিচ্ছি। অল্পে সন্তুষ্ট হওয়ার দিন চলে গেছে, এবার প্রাপ্যটুকু চাই। এবার অধিকার সবটুকু চাই।

যায় যায় দিন, ঢাকা

কিছুটা ব্যক্তিগত, অনেকটা সমষ্টিগত

১.

এই দেশের একজন লেখক পাশের একটি বড় দেশের অত্যন্ত সম্মানজনক পুরস্কার পেয়েছে। পুরস্কারের খবর ছাপা হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের একটি কাগজে যে বইটির জন্য পুরস্কার পেয়েছে লেখক, সেই বইটির বিরুদ্ধে এক পত্রিকায় কুৎসা রটনা করা হয়। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার, পুরস্কার দেবার আগে আগে সেই কুৎসার হাজার হাজার ফটোকপি পাশের দেশের পত্রিকা অফিসগুলোয় পাঠানো হয়, যেন তারা ওগুলো ছেপে দেয়, যেন পুরস্কারটি এদেশের লেখকের জন্য না জোটে। পুরস্কারদাতারা আশ্চর্য হয়েছিলেন; নিজ দেশে পুরস্কার পাবে—সেও সইতে পারবে না মানুষ?

আরও মজার ব্যাপার হল, পাশের দেশ যখন সেই লেখকের লেখার প্রশংসা করছে, তখন এই দেশ থেকেই তার ব্যক্তি জীবন নিয়ে নানা অশোভন গল্প তৈরি করে মোদ্দা কথা তার চরিত্র হনন করে চটি বই ছেপে পাশের দেশে পাঠানো হচ্ছে যেন ওরা আর লেখকের প্রশংসা না করেন, যেন চটি বই পড়ে তাঁরাও নিন্দা শুরু করেন, তবেই এ দেশি বাঙালির আনন্দ হবে। পাশের দেশের পত্রিকা অফিসে, ফুটপাতে এখন ব্যক্তিগত চরিত্রহননের চটি-বই ফ্রি পাওয়া যায়। কারণ দেশি নিন্দুকেরা লেখকের চরিত্র-হনন চটি-বই ফ্রি বিলোচ্ছে এদিকে, ওদিকে যদি লেখক আবার সম্মানিত হয়ে যান, এই ভয় প্রচণ্ড বলে গাঁটের পয়সা খরচা করতে এদের আপত্তি নেই।

রক্তে ইওসিনোফিল বলে একটি জিনিস থাকে, এটি বেশি থাকলে গা চুলকোয়। অধিকাংশ বাঙালির মধ্যে ইওসিনোফিলের পরিমাণ বোধহয় বেশি থাকে, কারও উত্থান দেখলে তার বড্ড মন চুলকোয়। বেঙ্গলি কাঁকড়ার গল্পও অনেকে জানেন নিশ্চয়ই। সেই যে একটি খোলা ড্রামে পড়েছে কিছু কাঁকড়া, খোলা ড্রাম থেকে ইচ্ছে করলে কাঁকড়াগুলো বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু কোনও কাঁকড়া বেরিয়ে আসছে না দেখে একজন প্রশ্ন করল, কি ব্যাপার ওরা বেরোচ্ছে না কেন? তখন পরীক্ষা করে দেখা গেল কোনও কাঁকড়া যদি বাইরে বেরোবার জন্য উপরে উঠতে যায়, তাকে পেছন থেকে বাকি কাঁকড়ারা টেনে নামিয়ে দেয়, ফলে কোনও কাঁকড়ারই আর ড্রাম থেকে বেরোনো হয় না। এই অবস্থা দেখে উপস্থিত সকলে ধারণা করলেন—এ নিশ্চয়ই বেঙ্গলি কাঁকড়া। কারণ বাঙালি ছাড়া আর কোনও জাত নেই জগতে যে নিজে তো ওঠেই না, বরং কোমর বেঁধে অন্যের উত্থান থামায়।

এদেশের লেখক, তিনি এদেশেরই মানুষ, এদেশের মানুষের ভালর জন্য তাঁর কলম চলে। এদেশের সমাজব্যবস্থা পাল্টাবার জন্য তিনি পরিশ্রম করছেন। ঝুঁকি নিচ্ছেন। বিদেশে তার সম্পর্কে ভাল ভাল কথা লেখা হচ্ছে। এই ভাল কথাগুলো পড়ে আঁতকে উঠেছেন এই দেশের লেখক, সাংবাদিক, এবং কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক ও সঙ্কীর্ণমনের 'বুদ্ধিজীবী'। অন্য দেশে যখন ভাল কথা ছাপা হয়, তাঁরা এর পেছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র খোঁজেন, এবং হঠাৎ যখন মন্দ কথা ছাপা হয়—তখন একযোগে সেসব পুনর্মুদ্রণ করেন এদেশের পত্রিকায়। পাশের দেশ মন্দ কথা বললে খুশিতে গদগদ হন, পারলে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেন।

২.

নির্বাচনের আগে বিএনপি বলেছিল হাসিনাকে ভারত নাকি পাঁচশ কোটি টাকা দিয়েছে। আওয়ামী লীগও বলেছিল খালেদাকে পাকিস্তান থেকে দু'শ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এই টাকা দেওয়ার প্রমাণ কিন্তু কেউ হাজির করতে পারেনি। একই রকম লজ্জা নামের একটি উপন্যাসিকা লিখবার জন্য বিজেপি এক লেখককে পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকা দিয়েছে বলে যারা প্রচার করছে তারাও প্রমাণ করতে পারবে না এই মনগড়া প্রচার। কিন্তু শুধু শুধু তারা অপপ্রচার করছে কেন? তারা কি তবে কারও কাছ থেকে টাকা খেয়েছে? নাকি ফ্রি এমনি?

৩.

রহমান জাহাঙ্গীর নামের এক সাংবাদিক ক'দিন আগে বহু অনুনয় বিনয় করে আমার কাছে একটি সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করেন, নিউজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার জন্য। বাংলাদেশে তিনি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় কাজ করেন। পত্রিকার গুণে আমার গা রি রি করে উঠল। আমি তাঁকে সাক্ষাৎকার দিতে আপত্তি করছি বুঝে তিনি বারবার বললেন এটি তিনি নিউজ পত্রিকার জন্য নিচ্ছেন, এই পত্রিকা থেকে আমার সাক্ষাৎকার নেবার জন্য তাঁকে টেলেক্স পাঠানো হয়েছে। অগত্যা রাজি হই। কিছুক্ষণ কথা বলি। তিনি কথাবার্তা কাগজে টুকে নিয়ে চলে যান। এই ঘটনার কয়েকদিন পর আমার এক শুভাকাঙ্ক্ষী বলল, "আশ্চর্য, তুমি ইনকিলাব গ্রুপের পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিয়েছ?"

না তো! আমি অবাক।

তবে যে টেলিগ্রাফে তোমার সাক্ষাৎকার ছেপেছে!

রহস্যটি পরে ধরতে পারলাম। রহমান জাহাঙ্গীর নামের ধড়িবাজ সাংবাদিকটি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। তিনি নিউজ পত্রিকার জন্য সাক্ষাৎকার নিয়ে নিজেদের মৌলবাদী কাগজে আমার সেই সাক্ষাৎকার বিনা অনুমতিতে ছেপে দিয়েছেন। তিনি খুব ভাল করেই জানেন মাওলানা মান্নানের কাগজে আমি কোনও সাক্ষাৎকার দেব না, তাই এই প্রতারণার আশ্রয়। লোকটি একদিকে যেমন অসৎ সাংবাদিক, আরেকদিকে তেমনি বিকৃত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি। আমার ছোট চুল, পোশাক, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে তিনি যে অশোভন মন্তব্য করেছেন তাতে আমার তাই মনে হয়েছে। এঁরা ভেবেই নিয়েছেন মেয়ে মানে মিশকালো লম্বা চুলের শাড়ি পরা সাজগোজ করা লাজুক লাজুক কিছু। এই ছকের বাইরে মেয়ে দেখলে এঁরা চোখে সর্ষেফুল দেখেন, এঁদের কানে গরম হাওয়া বয়, মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে এবং হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

[illegible], ঢাকা

আলস্য ত্যাগ কর। কর্মঠ হও। গন্ডি ভেঙে ফেল।

১.

মেয়েরা পড়ালেখা করবে, তারপর কি হবে? নার্স, শিক্ষক নয় প্রাইভেট সেক্রেটারি। আর পড়ালেখা না করে হবে দরজি নয় পরিচারিকা। এই গন্ডিতেই তারা বাঁধা। গন্ডির বাইরে বেরোলে লোকে বিস্মিত হয়। সেদিন প্ল্যানিং কমিশনে উঁচু পদে চাকরি করেন একজন মহিলার সঙ্গে কথা হল, তিনি বললেন—সকলে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে আপনি চাকরি করছেন কেন? মানে আপনার কি টাকা পয়সার অভাব? অভাব না হলে ঘর সংসার রেখে চাকরি করার দরকারটা কি? কিছু যদি করতেই হয় সোস্যাল ওয়ার্ক করুন।

মেয়েরা চাকরি করবে, বাচ্চা সামলাবে, স্বামীর জন্য রান্নাবান্না করবে, স্বামীদের আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিজের রান্না করা খাবার খাওয়াবে, বাচ্চাকে স্কুলে নেবে, পড়াবে, এসব না করে, অথবা এসবে ফাঁকি দিয়ে চাকরি করতে আসার কোনও কারণ লোকে খুঁজে পায় না। উঁচুপদে চাকরি করে সাবঅর্ডিনেট পুরুষদের যখন তখন আদেশ নিষেধ করা কেমন যেন বেখাপ্পা লাগে। তা ঠিক। প্রাইভেট সেক্রেটারি হলে মানায়—সেজেগুজে আসবে, অফিসাররা যা বলবে তৎক্ষণাৎ তা পালন করবে, ফাইলটা এগিয়ে দেবে, কলমটা, পারলে চাটা, গায়ের কোটটা, টাইটা, চশমাটা। অনেকটা বিকল্প স্ত্রী। ঘরে স্ত্রী রেখে এসে স্ত্রীর স্বাদ প্রাইভেট সেক্রেটারিকে দিয়ে মেটানোর খায়েশ হয় অনেক ডিরেক্টর, অনেক এম ডির। যেন দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো।অথবা ঘোলের স্বাদ দুধে মেটানো। মেয়েরা সেবা করবে নার্স যেমন সেবা করে, স্ত্রী যেমন করে, পরিচারিকা যেমন করে, দাসি না হয়ে মেয়েরা যদি প্রভু হয়ে ওঠে—সমাজ কি সহজে তা মেনে নেবে? নেবে না। কাউকে কাউকে তিরস্কার সয়ে, লোকের ভ্রুকুটি সয়ে কাজ করতে হবে। তিরস্কারের ভয় সবচেয়ে বেশি মধ্যবিত্তের। নিম্নবিত্তরা কেয়ার করে না তার গায়ের কাপড় বুক থেকে কতটুকু সরল বা গোড়ালি থেকে কতটুকু উঠল। তার পেটে খিদে আছে, সে খিদে মেটাতে কাজ করে। বিত্তবান মেয়েরা করে টাকার জন্য না হোক অবসর কাটানো বা একধরনের বৈচিত্র্যের জন্য। অথচ মধ্যবিত্তরা ঘোমটায় মুখ ঢাকে। তাদের নানারকম সংস্কার। স্বামী অনুমতি দেয় না, লোকে কী বলবে, বাচ্চা কাচ্চা মানুষ হবে না ইত্যাদির ছুতোয় ঘরে বসে থাকে, ঘরে বসে গয়নাগাটি শাড়িজামার ডিজাইন, মাধুরি দিক্ষিতের নাচ আর হুমায়ূনের হাসির নাটকে মেতে থাকে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মেয়েরা যদি দলে দলে কাজ করতে না বেরোয়, তবে নিজের স্বাধীনতাকে নিজের হাতে বলি দেওয়া হবে। আসলে সেই পরিবারে মেয়েদের বিয়েই করা উচিত নয়, যে পরিবারে স্ত্রীর চাকরি করা বারণ। সেই পুরুষের প্রেমে সাড়া দেওয়াই উচিত নয়, অথবা প্রেম করাই উচিত নয় যদি না পুরুষেরা নারীর স্বাধীনতায় কোনও বাধা হয়। চাকরি করলেই নারী তার তাবৎ স্বাধীনতা পেয়ে গেল, তা ঠিক নয়। কিন্তু কোনও কাজ কেন সে করবে না যদি কাজ করবার যোগ্যতা সে অর্জন করে? তা হলে তাকে লেখাপড়া করিয়ে রাষ্ট্রের কি লাভ হল? রান্নাবান্না এবং শিশু পালনের কাজ পরিচারিকাই পারে অথবা স্বামী স্ত্রী দুজন মিলেই এই গার্হস্থ্য বিজ্ঞান সম্ভব। প্রতিটি নাগরিকের জন্যই, আমি মনে করি, কাজ করা নৈতিক দায়িত্ব। তার মত দেশদ্রোহি আর কে আছে যে তার মেধা ও প্রতিভাকে অবলীলায় ধ্বংস হতে দেয়, এর

চেয়ে বড় ক্ষতিকর আর কি আছে যদি তাকে নিয়ে দেশ বা সমাজের কেবল ব্যয় হয়, কোনও আয় না হয়।

২

গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে মেয়েরা দল বেঁধে যখন কাজ করতে যায়, এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আমি মনে করি না এদেশে আর কিছু আছে। যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে পারছে না, বাল্যবিবাহের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, সংসারে অভাব, অথবা যে মেয়ে স্বামীর ওপর নির্ভর ছিল—স্বামী তাকে ছেড়ে চলে গেছে অন্য কোথাও অথবা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, অথবা স্বামী যেটুকু উপার্জন করে তাতে সংসার ভাল চলে না—তাদের জীবনের এখন মোড় ঘুরে গেছে। তারা টিফিনক্যারিয়ার হাতে রাস্তায় নামে। হাঁটে। বাসে চড়ে। নাম দস্তখত করে। সারি বেঁধে চেয়ারে বসে। সকাল সন্ধ্যা কাজ করে। যে মেয়েরা কোনওদিন চুলে তেল পেত না, তারা এখন নিজের পয়সায় কেনা তেল মাখে চুলে, নিজের পয়সায় পায়ের জুতো কেনে তারা, যারা কোনওদিন জুতো পরে দেখেনি কেমন। নিজের পয়সায় তারা ভাত মাছ খায়। এ নিশ্চয়ই বিত্তবান স্বামীর পোষা বধূদের চেয়ে ঢের মর্যাদার জীবন। দল বেঁধে নিম্নবিত্ত মেয়েরা যখন কাজ করতে যায়, রাস্তায় খুঁজে পাওয়া-তখন আমার খুব ঘৃণা হয় ওদের প্রতি, যারা ওই সময়ে কাজকর্মহীন অবসর কাটায়, প্রতিবেশির সঙ্গে তুচ্ছ হাসি ঠাট্টায় মাতে। সোনা বা শাড়ির দোকানে যায়, ভরি ধরে সোনা কেনে সাজবে বলে, দামি দেখে শাড়ি কেনে পুরুষ পটাবার আশায়।

৩

নার্স, শিক্ষক, প্রাইভেট সেক্রেটারি—এসবের মধ্যে মেয়েদের সীমাবদ্ধ যারা রাখতে চায়, তারা পুরুষতান্ত্রিকতায় ভোগে। মেয়েরা কিসে দক্ষ নয়? তাদের কেন সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হবে? তারা কেন অসীম ছোঁবে না? ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আর্কিটেক্ট যেমন হতে পারে নারী, নারী পাইলট ড্রাইভার রিক্সাচালক সবই হতে পারে, সাংবাদিক হতে পারে, সাংসদ হতে পারে। অভিনয় করছে নারী, চিত্রনাট্যও লিখবে সে, চিত্রপরিচালকও তাকে হতে হবে, লাইটম্যান, মেকআপম্যান, সবই। জগতে কাজের অভাব নেই। যে কোনও কাজেই নারী তার দক্ষতা পারদর্শিতা অনায়াসে দেখাতে পারে। অবসরে সোস্যাল ওয়ার্ক করবার দিন শেষ হয়েছে, তাদের এখন ঝুঁকি নিতে হবে, বড় বড় দায়িত্ব নিতে হবে কাঁধে। তা না হলে দিন যেমন ফেরেনি নারীর, আর ফিরবেও না। সমাজের সর্বত্র তার বিস্তার প্রয়োজন। রাষ্ট্র জুড়ে নিজেকে ছড়িয়ে না দিলে গন্ডির জীবন গন্ডিতেই থেকে যাবে।

নারী এখন কি চায়, তাকে গন্ডিবদ্ধ করবার সকল আয়োজন উপেক্ষা করতে নাকি যেমন আছে তেমন—পুরুষের সেবা শুশ্রূষায় কাটিয়ে দিতে জীবন?

খবরের কাগজ, ঢাকা

সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ থানার কালিকাপুর গ্রাম। খালেক মিস্ত্রির ষোল বছরের মেয়ে ফিরোজা নদীতে চিংড়ি মাছের পোনা ধরে সংসারে সাহায্য করে। এই পোনা ধরতে গিয়েই তার সঙ্গে পরিচয় হয় কালিগঞ্জ থানারই বন্দকাটি গ্রামের জেলে হরিপদ মণ্ডলের ছেলে উদয় মণ্ডলের। ফিরোজার সঙ্গে উদয়ের সম্পর্ক গড়ায়। এক রাতে উদয় মণ্ডল ধরা পড়ে ফিরোজাদের বাড়িতে, অভিযোগ পড়ে গরু চুরির। মুজিবর মেম্বরের নেতৃত্বে ওই রাতেই সালিশি বৈঠক করা হয়, উদয়কে পনেরোশ টাকা জরিমানা করা হয়, উদয়ের অভিভাবক টাকা দিয়ে ছেলেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। এদিকে আরেক ইউপি সদস্য এস্তাজ আলী এই জরিমানার বিচার মেনে নেয় না, সে চেয়ারম্যানকে দিয়ে নির্দেশ দেয় খালেক মিস্ত্রি যেন জরিমানার পনেরোশ টাকা নিয়ে তার কাছে যায়। অবশ্য পুরো টাকা খালেক মিস্ত্রি দিতে পারেনি, তিনশ টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল, তাই বারোশ টাকাই ছেলের হাত দিয়ে পাঠায়। চেয়ারম্যানের কাছে গেলে ছেলেকে প্রচণ্ড মারধোর করে চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যান ফিরোজার বাবাকে শরিয়ত মত বিচার করবে বলে জানায়। তা না হলে তাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে বিচারকেই মেনে নেয় খালেক মিস্ত্রি। পয়লা সেপ্টেম্বর বিকেলে কালিকাপুর গ্রামের ওয়াজেদ শেখের বাড়িতে সালিশ বসে। গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর আর মওলানা ছিল সালিশে। বন্দকাটি আহমদিয়া মাদ্রাসার সুপারেনটেনডেন্ট আবদুর রহিম ফতোয়া দেয় ফিরোজাকে একটি বাঁশের খুঁটিতে বেঁধে একশ একবার ঝাঁটাপেটা করতে হবে। সালিশে উপস্থিত সবাই ধর্মীয় মতের এই শাস্তিকে অত্যন্ত যৌক্তিক বলে বিবেচনা করে।

তখন সত্যি সত্যিই ফিরোজাকে ঝাঁটা পেটা করা হয়। খালেক মিস্ত্রি যেন এই দৃশ্য দেখে, সে জন্য তাকে সামনে রাখা হয়। ঝাঁটা মারা শেষ হলে ফিরোজা তার বোনের কাঁধে ভর দিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। বাড়ি গিয়ে সে বিষ খায়, অবশ্য সে বিষ খেয়েছিল কিনা তা পোস্টমর্টেম রিপোর্টই বলবে। ফিরোজার বোন জানিয়েছে যে, সে বাড়ি এসে এক গ্লাস জল খায়, তারপরই মরে যায়। যেভাবেই মরুক, মরেছে তো। সে যদি আত্মহত্যাই করে, কেন করেছে? ঝাঁটাপেটার কারণেই তো! কিন্তু ঝাঁটাপেটা ফিরোজাকে কেন করা হয়েছে? এটা কোন দেশের বিচার? আর বিচারই বা কেন? ফিরোজার দোষ কি? কি দোষে তাকে বিচার করে গ্রামের মওলানা? হিন্দু যুবকের সঙ্গে মুসলমান মেয়ে প্রেম করেছে—এই অপরাধ? এই অপরাধে একশ একটা ঝাঁটার মার মারতে হবে মেয়েকে, নাকি ব্যভিচারের দোষে, যে দোষে কেবল মেয়েরাই দোষী হয়, পার পেয়ে যায় পুরুষেরা? কি দোষের বিচার হল ফিরোজার, আমি বুঝতে পারি না।

আমার মনে হয় মেয়েদের পেটাতে হলে বা মেরে ফেলতে হলে কোনও দোষের দরকার হয় না। সালিশ বসিয়ে মওলানারা ফতোয়া দিলেই চলে। ইসলামি আইনের মাধ্যমে বিচার–এ তো আর কারও না মানবার কারণ নেই। রাষ্ট্রের ধর্ম যখন ইসলাম, তখন ইসলামি আইনকেই গ্রামেগঞ্জে শ্রদ্ধা করা হচ্ছে। বিধর্মীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা তারা অন্যায় মনে করছে অথবা এটিকেই ব্যভিচার জ্ঞান করে শাস্তি সাব্যস্ত করছে। অথবা কিছুই না, একশ পুরুষের চোখের সামনে ষোল বছরের একটি মেয়েকে পেটানো, মেয়েটি ক্রমে নীল হবে, বেহুঁশ হবে, ব্যথায় কাতরাবে, কাঁদবে, চিৎকার করবে—এসবই হয়ত পুরুষদের উপভোগের বিষয়। একটি মেয়ের যন্ত্রণা উপভোগ করবে সালিশের পুরুষেরা। ছাতকছড়া গ্রামের নূরজাহানকে এক মওলানার ফতোয়ায় ঢিল ছুঁড়ে মারা হল, কালিকাপুর গ্রামের ফিরোজাকে একশ একটা ঝাঁটার মারে মরতে হল—এই মওলানারা কারা? হয় মাদ্রাসার সুপার, নয় মসজিদের ইমাম, অর্থাৎ সমাজের গণ্যমান্য লোক এরা। এদের ফতোয়া দেবার অধিকার কে দিয়েছে? কেন গ্রামবাসী

মেনে নেয় এই বদমাশ লোকদের ফতোয়া? আর গ্রামের নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা এ ধরনের অন্যায় বিচার করবার স্পর্ধা পায় কোত্থেকে? এইসব মওলানা এবং ক্ষমতাবান মেম্বার-চেয়ারম্যানের পেছনে কোনও এক অদৃশ্য শক্তি নিশ্চয়ই আছে, তা নাহলে তারা এই অদ্ভুত বিচার করবার সাহস করত না। অহরহই এ ধরনের বিচার হচ্ছে, আমরা কেবল কেউ মরে গেলে খবর পাই, তবুও সব মৃত্যুর খবর আমাদের কাছে আসে না। কিছু মৃত্যু নীরবে ঘটে যায়। যেটি নিয়ে কোনও পত্রিকা উৎসাহ দেখায়, সেটিই কেবল জানি। সেটি নিয়ে ক'দিন চিৎকার-চেঁচামিচি করি। বাস্, একসময় সবই থেমে যায়। কারণ সাধারণ মানুষের চিৎকারে ক্ষমতাসীন অসাধারণের কি যায় আসে! দু'একজনের আপাত একটি শাস্তির ব্যবস্থা হয়, পরে ছাড়া পেয়ে যায়। কালিকাপুর গ্রাম থেকে দশই সেপ্টেম্বর তারিখে মওলানা আর চেয়ারম্যানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু তারা ক'দিন থাকবে হাজতে বা জেলে? আমরা অনুমান করতে পারি মৌলবাদী এবং সরকারি দলের হস্তক্ষেপে খুব শিগগির তারা ছাড়া পাবে। আমরা অনুমান করতে পারি ফিরোজার মৃত্যুর জন্য শেষ অবধি কোনও শাস্তি হবে না কারও। কারণ মওলানা এবং ইউপি চেয়ারম্যান দুজনই বর্তমান সরকারের আদরের লোক। সরকার তাদের অপরাধ 'নিজ গুণে' ক্ষমা করবেন। অপরাধী চিরকাল ফিরোজারাই হবে, চিরকাল নূরজাহানরাই হবে, তাদের অপরাধের কোনও সীমা নেই, তল নেই। এরকমই নিয়ম চলে আসছে হাজার বছর ধরে। এরকম নিয়মই মানুষ মানছে। হঠাৎ হঠাৎ ফাঁসি হয় কারও, মুনিরের যেমন হল, তাও রীমা এক শহীদ সাংবাদিকের কন্যা বলে। যে কন্যারা প্রতিদিন মরছে, তাদের বাবা হয়ত বড় কোনও সাংবাদিক নয়; কোনও দিনমজুর, কোনও কৃষক, কোনও দরিদ্র অখ্যাত লোক—তাদের কন্যাদের মৃত্যুর জন্য কারও কোনও জেলফাঁসি হয় না।

ফতোয়াবাজ মওলানারা পার পেয়ে যায় চিরকালই। অথচ এদের বিচার হওয়া উচিত, শাস্তি হওয়া উচিত। এরা হাজার হাজার ফিরোজাকে, নূরজাহানকে হত্যা করছে। সমাজ যদি সুস্থ হতে চায় তবে সবার আগে ফতোয়াবাজ মওলানা নামক জীবাণু নাশ করতে হবে। পঙ্গপাল যেমন শস্য নষ্ট করে, এই মওলানারা তেমন সোনার বাংলার গ্রামগুলো নষ্ট করে ফেলছে। তাদের যদি এখনও নির্মূল না করা হয় তবে একদিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে গোটা বাংলাদেশ। তখন হাহাকার করে লাভ কিছু হবে না। তাই এখনই সতর্ক হতে হবে আমাদের সবার। আপাতত সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে কালিকাপুর গ্রামে, আটকা পড়া মওলানা আর চেয়ারম্যানের দিকে। ফতোয়া দেবার অপরাধে তাদের যেন মৃত্যুদণ্ড হয়।

খবরের কাগজ, ঢাকা

কলকাতার কর পরিচয় আমার হাতে আসে না। হাতে হাতে বিদেশি পরিচয় আসে, তাও বাসি হয়। আজ বাংলাদেশের একটি মৌলবাদী পত্রিকা আক্রমণের ছলনা করে আবিদুল হকের একটি লেখা পুনর্মুদ্রণ করেছে। আজ সেই লেখাটি পড়ে আমি হীতিমত চমকে উঠেছি। লেখাটি প্রকাশিত বিশ্বজিৎ, তাঁর বিশ্বাসের কারে এই হাল! তিনি একসময় মূর্তি ভেঙেছেন আপন, এখন সাম্প্রদায়ের নামে মানুষের মুখোশ ভেঙেছেন, আজ তিনি আমার মুখোশও ভাঙছেন। বাংলাদেশের মৌলবাদীরা আমাকে প্রায় প্রতিদিন মৃত্যুদণ্ডের হুমকি দিয়ে চলে। কিন্তু ঈশ্বরের এত মৃত্যুদণ্ডের কথা বাস্তবায় করে না, নরকাল বিশ্বজিৎ যে তাদের বাস্তবায় করেছেন। আমি কলকাতার কোনও বন্ধুরা হামলাকারী শিক্ষিকা শাহাদাতীকী চাইলেন তা উচ্চারণ করিনি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রামমোহন এসবে আমি নির্বাচিত কলমে যা লিখেছি তা তিনি পড়েননি হয়তো আমার বিশ্বাস। উনিশ শতকে নারী শিক্ষার পীরমহত্তা সম্পর্কে আমি যেসি কিছু কথা তুলে ধরি না, এ বিষয়ে কিছু লেখা হয়েছে, সেসব পড়লে তাঁর ভুল জ্ঞান নিয়ে তিনি স্থিত হতেন আশা করি। নারী শিক্ষার পীরমহত্তা কি এখনও নেই? মোহাম্মদ লেখাপড়া করানো হয়, নয় গম সেদাই ছাড়া শেখানো হয় আলাদা কার জন্য? সে কি নারীর কোনও মঙ্গলের জন্য? নাকি পুরুষের তৃপ্তির জন্য? একবিংশ শতাব্দিতে নিয়ে গা ঝাড়াচ্ছে মানুষ—এখনও লেখাপড়া জানা মেয়েকে সেকেলেদানি করা হয়। মেয়েদের মেয়ের প্রতি অনিহা এখনও মনাহিয়ে যায় যায়।

তিনি আমাকে পুরুষ বিদ্বেষী বলেছেন। অপেক্ষিত লোকেরা তিন এই লেখাই আমাকে নিয়ে গবেষণা করে। আবিদুল বিশ্বজিৎ হয়তো কারার মেয়ে মেয়েকে পড়াননি। তিনি পুরুষ বিদ্বেষ এবং পুরুষতন্ত্রের বিভেদিবাকে এক করে দেখেছেন। কিন্তু কিছু নির্বোধ পুরুষ এই ভুলটি প্রায়ই করে।

তিনি লিখেছেন কিছু কথার লিখেছেন। লিখেছেন—২ মাসে অন্তত ৪জন সচিবকারের ধর্মান্ধতাকে বাংলাদেশের মৌলবাদিরা খুলন করেছে নিয়েছে। এদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক হুমায়ন, বাংলাদেশ সচিবের প্রকাশের ছলনী প্রকাশক মোস্তফা সুফিয়া কামাল। প্রথমত অধ্যাপক হুমায়ন নামের কোনও লেখক বাংলাদেশে নেই, দ্বিতীয়ত এঁদের মধ্যে ২ মাসে কেন, কোনও দিনই খুলন করেনি মৌলবাদীরা সেসি।

তিনি লিখেছেন আমি নাকি মনে করি 'কিছুর মধ্যে মেয়েদের পড়ায় চিমটি কাটিটাই' পুরুষদের কাজ। ভুল কথা। কেবল চিমটি কেটেই পুরুষেরা ক্ষান্ত পায় না, সময় ও সুযোগ মত তারা মেয়েদের অনেক কিছুই কাটে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পুরুষদের এইসব দুর্বিনীত কাজকারে মদদ করছে।

তিনি 'মেয়েদমনুষ্যকে অর্থের আকাশ বলেছেন। 'অর্থের আকাশ' কি মেয়েরা আদৌ পায়? পেলে আমরা এত আপত্তি নিশ্চয়ই থাকত না। অর্থের আকাশ নয়, যতের ছলনা পাশে যে একটুকরো আকাশ দেখা যায়, মেয়েদের জন্যে তার বেশি বোরাই না বিশ্বু। অর্থের আকাশ হলে মৌলবাদীদের অত্যাচার মেয়েদের সহ্যে হয় না প্রায় প্রতিদিন, পুরুষেরা তাদের লিঙ্গ

ছুঁচে—আগুনে পুড়িয়ে—বিষ খাইয়ে—গলায় দড়ি দেয়ে এত ম ত ন।

নারীর মুখে সেক্সের কথা শুনলে লোকে আঁতকে ওঠে। পুরুষেরা গালিগালি প্রচন্ড করে, নারীর শরীরকে বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করে, সেগুলো পড়ে বা দেখে কারই অসহ্য লাগে করে—কিন্তু নারী যদি নিজের শরীরের কথা বলে বা লেখে, আর সেটা পুরুষের মত অসংকোচ নগ্নকাশ বিশ্বজিৎও আঁতকে ওঠেন। সেই সংকারের ঊর্ধ্ব তিনি নিয়েছে পারেন নি, যে সংস্কার বলে নারীরা শরীর ঢেকে রেখে, আর সেই শরীর নিয়ে কাজ করবে পুরুষ, গড় নির্ধারণ হবি আঁকবে ব্যবসা করবে কেবল পুরুষই। নারীর শরীরের ওপর যেন নারীর চেয়ে অধিকার বেশি পুরুষেরই। শরীর নিয়ে পুরুষের মত চলাফেরা আমি করিনি। শরীর নিয়ে নিজস্ব প্রয়োজনের কথা, নানা কথা বলবার জন্য আমার লেখার বড় বিষয়ীন এসেছে নারী এবং পুরুষের শরীর। এ কোনও জটিলতা নয়। ঢাকায় বাসার নয়। সেক্কালসলে ঊর্ধ্বিও নয়। আমি ধর্মে বিশ্বাসী নই। সম্প্রদায়ে যে নই তা আমার অধিকাশ লেখায় এই বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। এ কারণেই আজ বাংলাদেশে আমাকে খুন করবার জন্য মৌলবাদী অনেকে। এই ধনবাদ আবিদুল হকের 'ভালোবাসা তখন মুসলমান মেয়েদের ইশপেশ নিক্ষেপ বিক্রিপি করছে' এ কথার উঁচু নিন্দা করছি আমি। মানুষের মধ্যে আমি বিশ্ব মুসলমান বিশ্বাস করি না। আমি কোথাও কখনও উপদেশ দিইনি কোনও মেয়েকে ধর্মীয় রাজনীতিকে বিশ্বাসী হতে, বরং তাদের ধর্মের মোহ থেকে মানুষকে মুক্ত করবার জন্য আমি জীবন বাজি রেখেছি।

আমার বিরুদ্ধে এ স্থানের অপপ্রচারে নেমে আবিদুল হকের কী লাভ আমি জানি না, তার এতে তাঁর বিশ্বজিৎ মুসলমান খুলে ফেলবের সম্ভাবনাটিও যে বেরিয়ে পড়ে, এবং মানুষের মৃত্যু কামনা তাঁর ধারণা ভালোবাসাটিও যে অন্ধকারে ঢাকলে ওঠে তা বোধহয় নিজেও জানেন না।

আন্ধকার, কলকাতা

১. গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোর মেয়েরা ক'ঘণ্টা কাজ করে? আট দশ বারো? অথবা তারও চেয়ে বেশি? এই মেয়েরা গ্রাম বা শহরের বস্তির নিরক্ষর দরিদ্র মেয়ে, তারা, ভোরবেলা বিত্তবানেরা বা আধা বিত্তবানেরা যখন রমনা রেসকোর্স সংলগ্ন অঞ্চলে শরীরের বাড়তি মেদ কমাতে দৌড়োয়, তাদের ছিড়িয়ে টিফিনক্যারিয়ার হাতে ফ্যাক্টরিতে যায়। তাদের অবশ্য মেদ কমাবার কোন তাড়া নেই। শরীরে তাদের মেদ জমবার কোন অবকাশ নেই, তাদের সময়ও নেই বেঁচে থাকবার মোটু শরীরের কসরৎ করবার। তারা যায় সারাদিন পরিশ্রম করে দুটো ডালভাতের পয়সা যোগাতে। সারাদিন পর সন্ধ্যের বা রাতে তারা ক্লান্ত শরীরে হেঁটে হেঁটে বাড়ির দিকে যায়। তাদের সময় নেই আমোদ আহ্লাদে সময় কাটাবার। তারা ভাত রাঁধবে। বাড়ির সবাইকে খাওয়াবে। পাতিলের তলায় যদি কিছু থাকে, নিজে খাবে। আবার পরদিন ভোর হলেই ছুটতে হবে ফ্যাক্টরিতে। এই যে তারা পরিশ্রম করছে দশ ঘণ্টা বারো ঘণ্টা, বিনিময়ে কী পাচ্ছে? এক্সপোর্টের লাভের কত পরিমাণ পাচ্ছে তারা? হিসেব করলে কী দাঁড়ায়? যাদের শ্রমের বিনিময়ে বাংলাদেশ বিদেশি মুদ্রা উপার্জন করছে, তারা কি তাদের দশ বারো ঘণ্টা শ্রম দিয়ে মাসের শেষে যা পায়, তা দিয়ে এক মাস ডাল-ভাত খেয়ে চলতে পারে? আমার তো মনে হয় পারে না। তাদের বেতন বাড়াবার জন্য সংগ্রাম তাদেরই করতে হবে এবং আরেকটি ব্যবস্থা অচিরেই করা জরুরি, তা হল—প্রতিটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। অন্তত দিনে দু'ঘণ্টা সময় বাংলা ইংরেজি অঙ্ক সাধারণ জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা যদি গার্মেন্টস মালিকরা নেন, আমার মনে হয় এটি এমন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হবে যে গত এক শতাব্দীতে নিম্নবিত্ত মেয়েদের জীবনে যে উন্নতি আসেনি সেই উন্নতি এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব হবে। মেয়েদের শিক্ষিত করবার আর তো উপায় দেখছি না। কর্মজীবী মেয়েদের ঘরে বাইরে নিজের স্বাধীনতা এবং অধিকার রক্ষায় সচেতন করবার জন্য প্রেরণা দেয়া জরুরি। তারা যখন রাত করে বাড়ি ফেরে, রাস্তার বদমাশ ছেলেরা যখন তাদের পেছন পেছন ছোটে—তাদের চোয়াল লক্ষ্য করে ঘা লাগাতে মেয়েরা যেন দ্বিধা না করে, যেন একযোগে দাঁড়িয়ে যায় সবকটি কর্মী মেয়ে। তারা যেন মাসের টাকাগুলো বর্বর, অলস, প্রতারক স্বামীর পেছনে খরচ না করে, যা তাদের করতেই হবে ব'লে তারা বিশ্বাস করে অথবা লোকেরা বলে বলে করে। এইসব বিষয়ে মেয়েদের পরামর্শ দেবার জন্যে ফ্যাক্টরিতে মানবাধিকারের ব্যাপারে সচেতন একজন শিক্ষক প্রয়োজন। মেয়েদের কেবল শিক্ষাই নয়, স্বাস্থ্যও রক্ষা করা জরুরি। মেয়েরা নিয়মিত চিকিৎসা পায় বলে আমার তো মনে হয় না। আমি কজন শ্রমিকের কথা জানি, তাদের অসুস্থতার কারণে ছুটি তো দেওয়াই হয়নি বরং যে কদিন আসতে পারেনি, বেতন কেটে রাখা হয়েছে। উচ্চবিত্তরা শোষণ করছে নিম্নবিত্তদের, এ আজকের ঘটনা নয়। কিন্তু এমন নির্লজ্জ শোষণ এই সভ্য যুগে বড় চোখে লাগে। কোটি কোটি টাকা আয় করছে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলো, শ্রমিকদের বাসস্থান এবং ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব। তারা সস্তায় শ্রমিক পাচ্ছে, দু'পয়সা খরচ করে লক্ষ কোটি টাকা পাচ্ছে, তারা অনেকটা হয়ত উদার হতে পারেন না, ব্যবসায়ীদের চরিত্রেই নেই

উদার হওয়া, তবু কিছুটা তো হতেই হবে উদার তাদের। না হলে নিজেরাই কেবল পকেট ভরবেন, যারা আপনার পকেট ভরায় সাহায্য করল তাদের পকেটে তেমন কিছুই দেবেন না—এ কী করে হয়?

২. আজকাল কাজের মেয়ে হত্যা যেন একটি সাধারণ ঘটনা। মেয়ে ফ্রিজ নষ্ট করল, চুরি করল তো গৃহকর্তা বা কর্ত্রী পিটিয়ে মেরে ফেলল তাকে। গরিবের মরা তো এমন কোনও বিষয় নয়। সে মরলেই-বা কী, না মরলেই-বা কী? বেঁচে থেকে তার লাভই-বা কী ছিল? তাই বিত্তবানেরা শখ করে কাজের মেয়েদের মাথায় অনায়াসে বসিয়ে দিতে পারে দা বা বটির কোপ। প্রথম পাতায় ছবি আসে। লোকে দু'দিন ছি ছি করে ...., এরপর মিটে যায়।

দুর্বলের ওপর সবলের শোষণ কবে বন্ধ হবে তার কোনও হিসেব আমরা দিতে পারব না। সম্ভব নয়। কিন্তু এমন একটি ব্যবস্থা সম্ভব করা যায় কি না যে বাসা বাড়িতে কোনও কাজের লোক-টোক রাখা চলবে না? নিজেদের কাজ তারা নিজেরাই করে নেবে? আমি জানি এই দরিদ্র দেশে এটি সম্ভব নয়, নিরন্ন উন্মূল মানুষ দ্বারে দ্বারে ঘুরবেই। তারা পেটের জন্য বাড়ি বাড়ি নির্যাতিত হবে। অতঃপর মরবে নয়ত কর্তা দ্বারা ধর্ষিতা হবে, নয়ত জীবন পার করে সম্বল কিছু না নিয়ে বেরোবে কর্মক্ষেত্র থেকে। তার চেয়ে সরকারি বা বেসরকারি ইন্ডাস্ট্রিগুলোয় বাধ্যতামূলক নারী শ্রমিক নেওয়া হলে আমার বিশ্বাস মরবার জন্য কেউ আর বাড়ি বাড়ি কাজ করতে আসবে না। এতে তাদেরও সম্মান রক্ষা হবে আর যাদের হাত নিশপিশ করে গরিব মারবার জন্য তারা তাদের হাতের কাছে সহজেই আর গরিবের গলা বা ঘাড় পাবে না। তারাও-জেল-জরিমানা থেকে এক রকম রক্ষা পাবে।

৩. সম্প্রতি সরকার এরকম আদেশনামা তৈরি করেছেন যে, এদেশে সব পত্রিকা আসতে পারবে কেবল কলকাতার 'দেশ' পত্রিকা ছাড়া। 'দেশ' কী দোষে দোষী হল তা আমার কাছে এখন আর অস্পষ্ট নয়। এই দেশে এখন মনোরমা, প্রিয়দর্শিনী, টেলিদর্শন ইত্যাদি পত্রিকার প্রবেশাধিকার বৈধ করা হয়েছে। এখন আমরা কী একটু বিচার করে দেখতে পারি মনোরমা, প্রিয়দর্শিনী এগুলো কী জাতের পত্রিকা এবং 'দেশ' কী জাতের। আসলে উঁচু জাতের পত্রিকা বলেই 'দেশ'কে বাধা দেয়া হয়েছে, যেন এখানকার পাঠক আবার মননে ও মেধায় উঁচু হয়ে না যায়। আর যে কোনও আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে মানুষকে ব্যস্ত হতে দিতে সরকারের কোনও আপত্তি নেই বলে হালকা রসালো পত্রিকাগুলো এদেশে আসতে কোনও বাধা নেই। সরকার আর যাই হোক জনগণকে রুচিবান ও বুদ্ধিমান হতে দিতে রাজি নয়।

আদেশনামার আর একটি প্রসঙ্গ, যে কোনও ফিল্মই এদেশে আসতে পারবে, কেবল উপমহাদেশীয় ভাষার ফিল্ম ছাড়া। অর্থাৎ বাংলা, হিন্দি ইত্যাদি এখন আর বৈধ নয়। এ আসলে ভিডিও দোকানগুলো থেকে পুলিশের টাকা কামানোর ভাল একটি পদ্ধতি। শেল্ফ থেকে সরিয়ে সবই ঢোকানো হবে টেবিলের তলায়। আর তলায় ঢোকানো জিনিস বেশি দামে ভাড়া নেবে নিরীহ 'পাবলিক'।

৪. এখনও শহীদ মিনারের সামনে রঙ মেখে নষ্ট করা রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত রামনিধি গুপ্ত, জীবনানন্দের বাণী। এগুলো কি নষ্টই থাকবে, নিরাময়ের কোনও উপায় নেই? নিরাময়ের এবং রক্ষণের? কেবল দেওয়ালের নয়, রাস্তার মোড়ে মোড়ে বড় [illegible] বোর্ডে

ভাষাকে ভালবাসবার কথা প্রচার করতে হবে, যেন চোখে পড়ে, যেন শহীদ মিনারের সামনে এসেই কেবল ভাষার কথা স্মরণ করতে না হয়। ভাষাকে ভালবাসবার আরও গূঢ় অর্থ হল, একই ভাষার মানুষকে ভালবাসা। 'বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার মুসলমান—আমরা সবাই বাঙালি'—এই সত্যভাষণ যতদিন সবার হৃদয়ে স্থান না পায় ততদিন ভাষার থারকে ফুল উপচে পড়লেও লাভ নেই কিছু। ততদিন একুশ আসবে, যাবে, বড় বড় সভা-সেমিনার হবে কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার আগুন নিভবে না, যে আগুনে আশংকা করি, একদিন না শহীদ মিনারও পুড়ে ছাই হয়।

৫. কাজী ইবনে রুশদ লিখেছেন—'শরীয়তে দুটি উপায়ে যৌন তৃপ্তি লাভ করা বৈধ করেছে। এক, বিয়ে করা এবং দুই, ক্রীতদাসী রাখা। এ দুটি পন্থা ছাড়া আর কোনও পন্থায় যৌনসুখ ভোগ হালাল হতে পারে না।' (মুকাদ্দামাতা ইবনে রুশদ-আল মাতবূআ মা'আল মুকাওয়ানাতিল কুবরা ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ২১, ২২)।

দাসী যে গৃহকর্তার ভোগের জন্য বৈধ তা আমাদের আধুনিক শিক্ষিত এবং ধার্মিক স্ত্রীরা মোটেও স্বীকার করতে চান না। তারা বলেন, এটা সে আমলের জন্য প্রযোজ্য ছিল, এখন ঠিক মানায় না। যদি কোরআন হাদিস সে আমলের জন্যই প্রযোজ্য হয় তবে এ আমলে তাকে নিয়ে এত ঘাঁটাঘাঁটিরই বা প্রয়োজন কী? সে আমলের জিনিস সে আমলে ফেলে রাখলেই হয়।

৬. বাঙালি সংস্কৃতিকে অনেকটা গ্রাস করে নিয়েছে ইউরোপিয়ান কালচার। দুটোই মিলে মিশে বেঁচে ছিল, তবে ইউরোপিয়ান কালচারটা ছিল দৈনন্দিন এবং বাঙালি সংস্কৃতি নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল কোনও পরব বা উৎসবের জন্য। ইদানীং যে সংস্কৃতি ইউরোপিয়ান কালচারের সঙ্গে মিশে এক অদ্ভুত আকৃতি নিচ্ছে সে হচ্ছে ইসলামি সংস্কৃতি। প্রতিটি ঘরে মানুষ রোজা রাখুক বা না রাখুক ইফতার সাজানো হচ্ছে টেবিলে এবং ঠিক সময়মত বাড়ির সদস্যরা 'ইফতার' নামক খাবার খাচ্ছে। ইফতার এখন এক মাসের কালচারে ঢুকে গেছে। এর সঙ্গে সংযমের কোনও সম্পর্ক নেই। মুড়ি-ছোলা-পিয়াজু-বেগুনির এই সংস্কৃতি যত গভীর করে আমরা জীবনযাপনে প্রবেশ করাচ্ছি, তাতে মনে হয় না আমাদের আর শক্তি আছে ইসলামের মোহর করা দরজা-জানালা ভেদ করে জগতের আলো-হাওয়া প্রবেশ করাবার, ঘরে এবং অন্তরে।

খবরের কাগজ, ঢাকা।

যে দেশ গোলাম আযমের দেশ, সে দেশ আমার দেশ নয়। মেঘনা যমুনা পদ্মা ব্রহ্মপুত্র এ দেশ আমার নয়। এ দেশ গোলাম আযমের। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া এখন তাঁর। গোলাম আযম এখন চাইলেই দেশের রাজা হতে পারে।

ভাবতে এখন আমার আর ঘৃণা হয় না যে এই দেশে গোলাম আযম বাস করছে, ভাবতে এখন লজ্জা হয়। আমি মুখ দেখাতে পারি না আমার ভাইবোনের সামনে, যুদ্ধাহত মামার সামনে, খালার সামনে। মনে হয় গোলাম আযম যে বৈধতা পেয়েছে এ দোষ আমার, এ লজ্জা আমার। সে এখন দেশ জুড়ে অবাধ বিচরণ করবে। তার মার্সিডিজ আমাদের গায়ে ধুলো বা কাদা ছিটিয়ে চলে যাবে, দূর থেকে ভেসে আসবে গোলামের কনকনে হাসির শব্দ। আমাদের বুকের মধ্যে আমরা কান্নার শব্দ শুনব। শিরিষ, পলাশ, কৃষ্ণচূড়াও দুলে দুলে কাঁদবে, পদ্মা মেঘনা কর্ণফুলি সুরমা কাঁদবে, যমুনা কাঁদবে। গ্রীষ্মের লু হওয়া, সেও কাঁদবে। আমরা কারও কান্না থামাতে পারব না।

এই দেশে গণআদালত-এর সভায় মাইক ছিঁড়ে নেয়া হয়, এই দেশে গণসমাবেশে লাঠিচার্জ হয়, মানুষ আহত হয়, এই দেশে গোলাম আযম সসম্মানে মুক্তি পায়। এই দেশ কি আমার? '৫২, '৬৯,'৭১ কি এই দেশের কোনও ঘটনা? আমরা কি রফিক, সালাম, মিন্টু, মোস্তফা, মতিউর, মহীউদ্দিন-এর উত্তরসূরী? কেন যেন বিশ্বাস হয় না। এই স্থবির জনপদ যেন বাংলাদেশ নয়।

আসলে আমাদের নিজেদেরই এখন নিজেদের চাবকানো দরকার। না হলে হুঁস হবে না আমাদের। পিঠে মরচে ধরে গেছে। আমাদের চোখ, কান জিহ্বায় মরচে ধরেছে, দিন দিন অচল, অক্ষম অনাথ হয়ে পড়ছি। আমাদের বোধ হয় আর সাধ্য নেই Out of bound তালিকায় গোলাম আযমের নাম বসাবার। এই দেশ এখন ধীরে ধীরে পাকিস্তানের পতাকা তুলবে। মাজারগুলো সবুজ কাপড়ের ওপর সাদা চাঁদ তারার পতাকা ঝুলোচ্ছে অনেকদিন। এবার ওদের গুরুঠাকুর জেল থেকে সদর্পে বেরিয়ে অবিকল সেরকমই এক পতাকা উত্তোলন করবে। কারণ সময় আসছে। জামাতপুষ্ট জাতীয়তাবাদীরা তো অনেকদিন গদির আরাম ভোগ করল, এবার গোলাম আযমের জন্য আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনিই তো দেশের বিজয়ী নেতা। এমন মহান বিজয় কার ভাগ্যে আর ঘটে! নাগরিকত্বের বৈধতা পেয়ে যাওয়ায় আমি অনেককে জিজ্ঞেস করেছিলাম—এসব কি হল?

কেউ বলল—যা হল ঠিকই হল।

কেউ বলল—এরকম হবে আগেই জানতাম।

কেউ বলল—তার চেয়ে বিদেশ পাঠিয়ে দিলেই পারত।

কেউ বলল—আরও কত বড় বড় কাজ আছে দেশের। এ একটা বিষয় হল ভাববার? হবে হয়ত। গোলাম আযম উল্লেখযোগ্য কোনও বিষয় নয়—যা নিয়ে ভাবা যায়। যার জেল ফাঁসি নিয়ে চিন্তিত হতে পারি।

একজন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা হাইকোর্টের রায় শুনে চিৎকার করে কেঁদেছেন, বলেছেন—পঙ্গু হয়েও

গর্ব ছিল দেশের জন্য যুদ্ধ করেছি। ঘাতকদের বিরুদ্ধে লড়েছি। কিন্তু আজ কি পেলাম?
এজন্যই কি যুদ্ধ করেছি? হায়রে নিয়তি!
বিচারপতি রায় দিয়েছেন—গোলাম আযম জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। তাকে বিদেশি
হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না। দালালির অপরাধে কাউকে নাগরিকত্বের অযোগ্য বলা যাবে
না। গোলাম আযমকে জামাতে আমীর নিযুক্ত করায় সংবিধান লংঘন হয়নি।
বাহ, বাংলাদেশ বাহ্। তুমি একবার যে শয়তানের নাগরিকত্ব হরণ করেছিলে আজ তাকেই
নাগরিকত্বের মালা পরাচ্ছ। সম্ভবত অচিরে তুমি তাদেরই মুক্তিযোদ্ধার সনদ দেবে যারা
গোলাম আযমের সঙ্গী ছিল, যারা পাকিস্তানের পক্ষ হয়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালির ঘরে আগুন
দিয়েছে, মানুষকে ধর্ষণ করেছে, গলা কেটেছে, চোখ উপড়ে নিয়েছে।
হ্যাঁ, তারাই আজ বরেণ্য, যারা স্বাধীনতার শত্রু ছিল, যারা 'পাকিস্তান আদর্শ রক্ষা তহবিল'
গঠন করেছিল, যারা দেশকে ন' মাস রক্ত ও লাশের ওপর ভাসিয়েছিল এবং আনন্দ করেছিল
বিজাতীয় বন্ধুদের সঙ্গে। তারাই আজ এদেশে নমস্য। আজ মনে হচ্ছে কী প্রয়োজন ছিল
গণতন্ত্রের নামে এক চরম ফাঁকিবাজির? যে গণতন্ত্র মর্যাদা দিতে জানে না একটি নতুন
দেশের, একটি নতুন পতাকার, নতুন একটি জাতীয় সঙ্গীতের? মিত্র ভারতের বিদ্বেষীতে
এবং শত্রু পাকিস্তানের প্রেমীতে এ দেশ ভরে গেছে। ঠাঁই নেই দাঁড়াবার, মুক্ত হাওয়া নেই
নিঃশ্বাস নেবার। যে দেশের স্বাধীনতাই এখনও সম্পূর্ণ হয়নি সে দেশে নিজেকে বড় পরবাসী
মনে হয়। এদেশ তবে কার? গোলাম আযম নাগরিকত্ব পাবার পর আমি জোর গলায়
বলতে বাধ্য হচ্ছি এ দেশ আমার নয়। এ দেশ আমার হতে পারে না। এ দেশ এখন গোলাম
আযমের। এ দেশ শয়তানের, রাজাকারের, এ দেশ ঘাতকের, খুনির, এ দেশ বেহায়া
বদমাশদের।

খবরের কাগজ, ঢাকা।

আমাদের প্রগতিবাদীরা বলেন, মৌলবাদ গেলেই সব সমস্যা ঘুচবে, উগ্র মৌলবাদই বড়
সমস্যা পাকায়। তাঁরা এও বলেন—ধর্ম নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। মানুষ নীরবে নিভৃতে
ধর্ম পালন করুক, রাষ্ট্রধর্মেও ইসলামটা বহাল থাকুক। কিন্তু দেশ থেকে যে করেই হোক
মৌলবাদটা বিদেয় করতে হবে।
আমি তাঁদের এই কথা মানি না। আমার কথা হল—ধর্ম যতদিন আছে, মৌলবাদ থাকবেই।
ঘরে সাপ ছেড়ে দিয়ে যদি কেউ সান্ত্বনা দেয় সাপকে বুঝিয়েছি সাপ আর ছোবল দেবে না।
সে কথা কি কোনও বুদ্ধিমান মানবেন? সাপ আজ ছোবল দিচ্ছে না, কাল দেবে। সাপকে
বুঝিয়ে শান্ত করবার কিছু নেই, সাপের কাজই ছোবল দেওয়া।
ঘরে ঘরে সাপ ছেড়ে দিয়ে সাপ ছোবল দেবে না এই গ্যারান্টি কোনও রাজনীতিবিদ দিতে
পারবে না, কোনও রাষ্ট্রপ্রধানও নয়। বিষবৃক্ষ বাড়ছে বলে তার ডালপালা কেটে দিলে বৃক্ষ কি
তার ডাল ছড়াবে না? বিষ ফলাবে না আবার শত শাখায়, পাতায়? বৃক্ষের কাজই তার শরীর
ছড়ানো। সুতরাং আমরা এই আশা করতে পারি না মৌলবাদ নামক বৃক্ষ কেটে দিয়ে
মৌলবাদ ঘোচাবো। আমরা যদি বুদ্ধিমান হই, আমাদের বোঝা উচিত, মাটির নিচে লুকিয়ে
আছে মৌলবাদের শেকড়, ধর্ম তার নাম। যদি সেই শেকড় উপড়ে ফেলা না হয়, তবে
মৌলবাদের ডালপালা তো বাড়বেই। ধর্ম তো আর শামুক নয় যে গুটিয়ে থাকবে!
মসজিদ মাদ্রাসা বাড়ছে দেশে। কেন? মসজিদ মাদ্রাসা দিয়ে মানুষের কি উন্নতি হয়?
মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে মানুষ 'মোল্লা' হলে কী লাভ হয় এই দেশের? একজন মোল্লা বা
মৌলবী দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে কতটুকু সাহায্য করে? তারা ঘরে ঘরে খতম বা খুতবা
পড়ে দেড়শ দু'শ টাকা আয় করে। ফ্রি খাবার পায়। কিন্তু এ তো কোনও লোভনীয় পেশা
নয়। তবে? তবে কাঁকে কাঁকে মানুষ এই পেশার দিকে ছুটছে কেন? কেবলই পারলৌকিক
সুখের লোভে? না, তা আমার মোটেও মনে হয় না। কারণ এরা ইহলৌকিক সুখের জন্য
অত্যন্ত কাতর। এরা তাদের স্থূল রুচির কারণে অল্প পরিশ্রমে টাকা উপার্জনের জন্য
মোল্লাগিরিতে নামে। এরা সাধারণত হয় মধ্যবিত্তের বখাটে গবেট ছেলে, নয়ত গ্রামের দরিদ্র
ছেলে। এই অধঃপতিত পুরুষেরা সমাজকে কী দিতে পারে চূড়ান্ত অধঃপতন ছাড়া?
এদের হাতে যদি দেশ চলে যায়, তবে আমরা কি অনুমান করতে পারি, কী পরিণতি হবে
দেশের? দেশের মানুষের? রাজনীতির? অর্থনীতির? সমাজ ব্যবস্থার? মূল্যবোধের? ধরা যাক,
একটি মহল্লায় একটি স্কুল ও দশটি মাদ্রাসা, বারোটি মসজিদ, ধরা যাক দেশে কোনও গান
নেই, কবিতা নেই, নাচ নেই, নবান্ন বা নববর্ষের উৎসব নেই, মহল্লা মহল্লায় ইসলামি জলসা
বসে। তখন কী পরিণতি হবে আমাদের—দেশ তো দিন দিন সেই পরিণতির দিকে যাচ্ছে।
'৬৯-এ বায়তুল মোকাররমের সামনে জামাতে ইসলামির সভা ভেঙে দিয়েছিল সচেতন
মানুষেরা। আজ কি সেই ক্ষমতা রাখে কেউ? আজ মানুষ আপসকামী। আজ তারা বলে, ঠিক

সাম্প্রদায়িকতায়, নিষ্ঠুরতায়, অত্যাচারে, অবিচারে! বোধহয় তারই পূর্বাভাস পাচ্ছি। প্রগতিশীল মুখোশের আড়ালে এ দেশে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে বাড়ছে মৌলবাদি সাম্প্রদায়িক লোক। টুপি দাড়িঅলা মৌলবাদির চেয়ে এরা আরও ভয়ংকর। আরও বীভৎস। এদের চেনা যায় না। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় এরা আমাদেরই লোক। এরা মুখোশ পড়ে ঘুরে বেড়ায় আমাদেরই আশে পাশে। এদেরই আমরা ভুল বুকে শ্রদ্ধা সম্ভাষণ করি। কবি শামসুর রাহমান লজ্জা বইটি বাজেয়াপ্তের বিরুদ্ধে লিখেছেন বলে এক কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক লোক শামসুর রাহমানকে প্রায় গালাগাল করেছে বলা যায়। এই সাম্প্রদায়িক লোকটি সমাজে কারও কারও কাছে আবার 'বুদ্ধিজীবী' হিসেবে পরিচিত। শুনেছি এই লোকটি এই দেশকে ইসলামিক রাষ্ট্র করবার তাগিদ অনুভব করে প্রায়ই। লজ্জা যখন প্রথম প্রকাশিত হল, সে বিভিন্ন কাগজে বলে বেরিয়েছে এটি ইতরশ্রেণীর উপন্যাস (সম্ভবত ইনকিলাবকেও হার মানিয়েছে তার এই মন্তব্য)। সে নাকি তার আল্লাহতায়ালার কাছে মোনাজাতও করেছে এই বইটি ভারতে তার জাত ভাই মুসলমানদের আবার কোনও বিপদ না ঘটায়। নিজ দেশের ভাইদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে দৃষ্টি নেই, সে নিয়ে তার হাত মোনাজাতের জন্য একবারও উত্তোলিত হয়নি কিন্তু অন্য দেশের ভাইদের জন্য হয়েছে। এরা আবার ভাল 'জাত বিশ্বাসী'। বিপদ যত না জামাতিদের নিয়ে, বিপদ এদের নিয়ে বেশি। এরা টয়লেট পেপার অলাদের চেয়ে ক্ষতিকর, ওদের চেয়ে এদের জিভের ধার, নখের ধার, দাঁতের ধার অনেক বেশি। এদের সম্পর্কে সজাগ হওয়া প্রয়োজন আরও বেশি। এরা বন্ধু হয়ে ঘরে ঢুকবে, চমৎকার বুলি আওড়াবে, কায়দামত কোপ বসিয়ে দেবে মুক্তবুদ্ধি অসাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনার ওপর, জামাতিরা ষড়যন্ত্র করে খোলা জনসভায়, রাস্তায়। আর এই পরজীবীরা করে মধ্যরাতে যেন কাকপক্ষী না জানে। সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে এরাই বিস্তার করছে সাম্প্রদায়িকতার সুক্ষ্ম জাল।

লজ্জা নিষিদ্ধ করে যদি পার পেয়ে যায় এই সরকার, তবে তসলিমা নাসরিনের ভীষণ ক্ষতি হল ভেবে যে হিংসুকরা আজ আনন্দ করছে তাদের জানিয়ে দিই, এতে তসলিমা নাসরিনের একক ক্ষতি কিছুই নয়, ক্ষতি জাতির, এই দুর্ভাগা জাতির, ক্ষতি 'বাঙালি মুসলমান' নামক অনগ্রসর অসভ্য অশিক্ষিত মানুষেরই।

খবরের কাগজ, ঢাকা।

সতীত্বের পাহারা

'সতীত্ব-বন্ধনী' বলে একটি বন্ধনী ছিল এক সময়, লোহা বা ইস্পাতের তৈরি একটি বৃত্তাকার বেড়ি, সামনের দিকে তিনকোণা ধাতব পাত, পাতের মাঝখানে দাঁতঅলা একটি ছিদ্র। এই বেড়িটি মেয়েদের কোমরে পরানো হত। তিনকোণা পাতটি যৌনাঙ্গকে ঢেকে রাখত। পাতের মাঝখানের ছিদ্রটি থাকত মূত্রত্যাগের সুবিধের জন্য। এই ছিদ্রটি দাঁতঅলা রাখা হত, যেন 'পরপুরুষ'রা এই ছিদ্রকে কাজে লাগাতে না পারে। পৃথিবীর কোন কোন দেশে এই সতীত্ব-বন্ধনী ব্যবহার করা হত এবং কবে থেকে—এর সঠিক কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে ধারণা করা হয় মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ায় এটি প্রথম তৈরি হয়। ইউরোপেও এটি ব্যবহার হত। ক্রুসেড যোদ্ধারা মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে যাবার সময় স্ত্রীদের এই লোহার বন্ধনী পরিয়ে যেত। যেন স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিতে না পারে স্ত্রীরা। কেবল যে ক্রুসেড যোদ্ধারাই এ কাজ করত, তা নয়, দূরে কোথাও যেতে হলে ক্রুসেড ছাড়া অন্য পুরুষেরাও স্ত্রীদের এই বন্ধনী পরাতো। এই বন্ধনী কেবল স্বামীর আদেশে মেয়েদের পরতে হত, তা নয়; সমাজের আদেশেও পরতে হত। ইতালিতে তো ছিলই, চীনেও এই বন্ধনীর ব্যবহার ছিল প্রচুর। কেউ কেউ বলে থাইল্যান্ডেও ছিল। ১৮৮৯ সালে পাচিংগার নামে এক জার্মান নৃতত্ত্ববিদ অস্ট্রিয়ার এক শহরে গিয়েছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে তৈরি পুরোনো একটি গির্জার সংস্কার কাজ দেখতে। তিনি গির্জায় মেঝেয় যে কাঠ ছিল তা সরানোর সময় নীচে একটি গর্ত দেখেন, সেই গর্তে একটি কফিন ছিল, কফিনটি ছুঁতে গেলেই ঝুরঝুর করে পচে যাওয়া কাঠ ঝরে পড়ল, বেরিয়ে এল ভেতরের কঙ্কাল। লম্বা চুল দেখে বোঝা যায় এটি কোনও মেয়ের কঙ্কাল। গায়ে যে পোশাকের অংশ সামান্য পাওয়া যায়, তাতে অনুমান করা হয় পোশাকটি সপ্তদশ শতাব্দীতে তৈরি। পোশাকটি সরানোর পর তিনি দেখেন কোমরে পেঁচানো লোহার বেড়ি। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তৈরি এই সতীত্ব-বন্ধনীটির ছিদ্রঅলা পাতে ছিল মোট একুশটি দাঁত। এই বন্ধনী দেখে জার্মান নৃতত্ত্ববিদ 'পাচিংগার' বিস্মিত হয়েছিলেন কি না জানি না। তবে আমি বিস্মিত হই পুরুষের উদ্ভাবন ক্ষমতা দেখে। সতীত্ব-বন্ধনীতে তালা লাগিয়ে চাবিটি পকেটে নিয়ে তারা ঘর থেকে বেরোতো। কিন্তু তাদের যৌনাঙ্গ থাকত খোলা। তাদের যৌনাঙ্গ যেখানে সেখানে ব্যবহারে কোনও বাধা ছিল না। কিন্তু ঘরের স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ব্যবহারে সন্দেহমুক্ত হবার জন্য এ রকম একটি লোহার পোশাক পরাতে তারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না। পুরুষের নিষ্ঠুরতার এটি একটি বড় উদাহরণ।

এই পৃথিবীর পুরুষেরা নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য লোহার বেড়ি বানিয়েছিল। এই পুরুষেরা নারীর সতীত্ব প্রমাণ করবার জন্য নারীকে মরা স্বামীর চিতায় তুলেছে, এই পুরুষেরা এখনও বীভৎস সব পন্থায় নারীর সতীত্ব রক্ষা করে চলেছে। নানা নিয়ম কানুন নারীর ওপর চাপিয়ে নারীর সতীত্বের মজা তারা উপভোগ করছে। আগে লোহার বর্ম ব্যবহার করা হত, এখন সামাজিক অঙ্গুলি নির্দেশেই কাজ হয়। সমাজ নারীকে বলছে ঘরে থাকো, স্বামীর আদেশ ছাড়া ঘর-বার হয়ো না, পরপুরুষের সঙ্গে মেশো না, মিশলে তালাক, মিশলে মরন। নারীকে হয়ত লোহার বেড়ি পরানো হয় না। কিন্তু অদৃশ্য একটি বেড়ি থাকে তার কোমরে পরানো। অদৃশ্য

একটি লোহার পাত থাকে যৌনাঙ্গকে ঢেকে রাখবার জন্য, মূত্রত্যাগের ছিদ্র থাকে একদম' [illegible]। পুরুষের সন্দেহের কোনও তল নেই। অবিশ্বাসের কোনও সীমা নেই। কিন্তু নারীকেই কেন সতীত্ব রক্ষা করতে হবে? পুরুষের পরনারীগমনে আদিম মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ কোনও যুগই কোনও বাধা দেয়নি। সতীত্ব-রক্ষা-এই শব্দটি পুরুষেরই তৈরি, লোহার বেড়িও তাদের তৈরি, সমাজের যে ব্যবস্থায় নারীকে সতী হতে হয়, এই ব্যবস্থাও পুরুষের তৈরি। পুরুষেরা কি নিজের জন্য অস্বস্তিকর কোনও ব্যবস্থা নিতে রাজি হবে? নিশ্চয়ই না। তাই সব আরতি, সব জ্বালা-যন্ত্রণা একা 'নারীর।' নারীর ভাগেই ঠেলে দেওয়া হয়েছে দুঃসহ জীবন।

অনেকে বলে আসলে গর্ভের সন্তানটি স্বামীর কিনা এটি প্রমাণ করবার জন্যই নারীকে সতী হতে হয়। স্বামী যদি অন্যত্র আর দশটি সন্তানের বীজ ফেলে আসে, তাতে ক্ষতি নেই, কেবল একটি জরায়ুর সন্তানের জন্য তার আগ্রহ উপচে পড়ে। এরও কারণ তারা আবিষ্কার করেছে, বলেছে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী যে হবে তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে হবে। উত্তরাধিকারী অন্যের ঔরসের সন্তান হলে স্বামীর পৌরুষের অপমান। আহা পৌরুষ! পুরুষের পৌরুষের তলায় নারী কতকাল পিষ্ট হচ্ছে। কতকাল পিষ্ট হচ্ছে নারীর ব্যক্তিত্ব, নারীর সর্বস্ব।

নারী কি পুরুষের পৌরুষ রক্ষায় সাহায্য করবার জন্য জন্ম নিয়েছে? সে কি পৃথক কোনও অস্তিত্ব নয়? পুরুষের সন্তানকে বৈধ প্রমাণ করবার জন্য নারী-জন্ম নয়। নারীর জীবন পুরুষের স্বার্থে উৎসর্গ করতে হবে কে বলেছে? তাদের বৈধ অবৈধের ধার নারী ধারবে কেন? এ তো এক নষ্ট সমাজের নিয়ম যে নিয়মের জাল খুলে নারী এখনও বেরোতে পারে নি। তাকে বেরোতে হবে, তাকে প্রমাণ করতে হবে তার জীবন একা তারই। তার সতীত্বের গায়ে তালা লাগিয়ে চাবি কোনও পুরুষের নেবার অধিকার নেই, নারীর দেহের চাবি নারীর কাছেই থাকতে হবে। এ ছাড়া নারীর মুক্তি নেই। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যেমন নারীর প্রয়োজন, যৌন স্বাধীনতাও নারীর প্রয়োজন, যৌন স্বাধীনতা না থাকলে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক যত স্বাধীনতাই নারীর থাকুক, সত্যিকার স্বাধীন সে নয়। নারীর যৌন স্বাধীনতার কথা শুনলে অনেকে নাক সিঁটকাবে, বলবে, ছিঃ ছিঃ নারীর আবার যৌন স্বাধীনতা কি? তাহলে তো সে বেশ্যা হয়ে গেল। নারীর সবটুকু স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে সমাজ যদি তাকে 'বেশ্যা' বলে, তবু বেশ্যা হওয়া ভাল, পুরুষের দাসী হওয়ার চেয়ে। আসলে যৌন স্বাধীনতা নারীর আরও সব স্বাধীনতার মত একটি স্বাধীনতা, নারী যে কোন স্বাধীনতা পেলেই তাকে 'বেশ্যা' বা 'নষ্ট' বলা হবে এই ভয় দেখানো হয়। এসব পৌরুষিক চক্রান্ত ছুঁড়ে ফেলে নারীকে যদি মানুষ হতে হয়, তার শরীর ও মনের সবটুকু স্বাধীনতা অর্জন করতেই হবে।

খবরের কাগজ, ঢাকা।

১. 'ভোরের কাগজ' নামের একটি পত্রিকা আমার 'কেন বাইবেল ও কোরানের নারী' নামক ধারাবাহিক রচনাটি আচমকা বন্ধ করে দিয়েছে। বন্ধ করবার কারণ ওরা বলছে, পাঠকের প্রচুর প্রতিক্রিয়া ওরা পাচ্ছে, বেশির ভাগই বিরূপ, ফলে এটি ছেপে যাওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আর এদিকে আমি মুখোমুখি হচ্ছি ঠিক এর উল্টো অবস্থার। পাঠক অভিযোগ করছে, 'অনেকদিন লেখাটি দেখছি না। আমরা কিন্তু ধারাবাহিকটির মুগ্ধ পাঠক ছিলাম।'

আমি এখন যাব কোন পথে? পত্রিকাঅলার পাঠক ভাবছে এক, আমার পাঠক ভাবছে আরেক। আসলে একটি সিদ্ধান্ত আমি এখন নিতে বাধ্য হয়েছি সেটি হল পত্রিকাঅলারা পাঠকের চাহিদার চেয়ে লেখকের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারটিকে প্রধান করে তোলেন। আমার দ্বারা সাধারণত কোনও সম্পর্ক নষ্ট হয় না। কারণ, যে কোনও সম্পর্কেই আমি যথাসম্ভব নিঃস্বার্থ হবার চেষ্টা করি। কিন্তু অপরপক্ষের পক্ষে নিঃস্বার্থ হওয়া সম্ভব হয় না বলে আমাকে একটি রহস্যময় চরিত্র হিসেবে তাঁরা দাঁড় করাতে চান এবং স্বার্থে ঘা পড়লে দূরে দাঁড়িয়ে তাঁরা আমার উদ্দেশ্যে কটূক্তি করেন এবং তা সঙ্গীসহ উপভোগ করেন।

এতে অবশ্য আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু ওদের যোগ-বিয়োগের খানিকটা ভুল হয়ে যায়। তা যাক। আমার আজকের বিষয় কিন্তু ভোরের কাগজ নয়। এবং এর আঁতেল সাংবাদিকরাও নয়।

২. ইহুদী ধর্ম (Judaism) ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কোনও রকম মন্তব্য করা যায় না। কিন্তু হিন্দু, খ্রিস্টান, বাহাই, বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে যথেচ্ছ মন্তব্য করা যায়। ইহুদি ও ইসলামের সমালোচনা করলেই কল্লা কেটে নেবার হুমকি আসে। ইহুদি এবং ইসলামের সম্পর্ক একদিকে গভীর, আরেক দিকে বৈরী। একেশ্বরবাদ এসেছে ইহুদি ধর্ম থেকেই। খ্রিস্ট জন্মের দেড় কি দুই হাজার বছর আগে ইজরাইলে ইহুদি ধর্মের শুরু। শুরুতে এ ধর্মে একেশ্বরবাদ ছিল না। গাছপালা, পাহাড়, পাথর, ঝর্ণা ইত্যাদি বস্তুকেই প্রথম পুজো করা হত। পরে দেবতা ইয়াহওয়ার (জিহোবা) কল্পনা পল্লবিত হয়। ইজরাইলের যাযাবর ইহুদিরা এক সময় প্যালেস্টাইনের কৃষি অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। তখন ইয়াহওয়াকে যুদ্ধের দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ধারণা করা হয়, দেবতার নাম নিয়ে মানুষের মধ্যে যুদ্ধের প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ সৃষ্টি করা অর্থাৎ মানুষকে হত্যা করে তাদের সহায় সম্পদ লুট করা ধর্মবিরুদ্ধ নয়।

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে আছে জেনেসিস (ঈশ্বর কিভাবে পৃথিবী, মানুষ ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন তার গল্প), এক্সোডাস (মোজেস-এর জীবনী, বিখ্যাত টেন কমান্ডমেন্টস ও অন্যান্য ধর্মীয় নির্দেশ এবং মিশরীয়দের অধীনতা থেকে ইহুদিদের মুক্তির কথা রয়েছে এতে), লেভিটিকাস (ধর্মীয় আইন), নাম্বারস (মিশর থেকে চলে আসার পরের ইতিহাস ও বিধি নিষেধ আছে এতে) ডয়টেরনমি (ধর্মীয় আইন) এবং জোশুয়ার বই (জোশুয়ার নেতৃত্বে ইহুদিরা কি করে প্যালেস্টাইন অধিকার করল সেই কথা) দ্বিতীয় ভাগে আছে জাজেস, রুথ, স্যামুয়েল, প্যারালিপোমেনন, এজরা, নেহেমিয়া, এসথার জোব, রাজা

জেজিক ও সলোমন ইত্যাদির বই। তৃতীয় ভাগে ঈশ্বরের দূত ইসহিয়া, জেরেমিয়া, এজেকিয়েল, দানিয়েল এবং আরো বারোজন ছোটখাট দেব দূতের বই। এই ইহুদি ধর্ম থেকেই পৃথিবীর বৃহত্তম দুটো ধর্ম খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। ইহুদিদের ওল্ড টেস্টামেন্টের বহু তত্ত্ব, ধর্মীয় আচার, ঘটনা ও কল্পনা খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম ধর্মে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের তৈরী ধর্ম বিশ্বাস কি করে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয় তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ইহুদি ধর্ম। পৃথিবীতে এখন ইহুদি ধর্ম থেকে উদ্ভূত খ্রিষ্টান ধর্মে বিশ্বাসীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। শতকরা হিসেবে সারা পৃথিবীতে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী এখন ৩২.৯%, মুসলিম, ৭.১%, হিন্দু ১৩.২%, বৌদ্ধ ৬.২ এবং ইহুদী ০.৪%। খ্রিষ্টপূর্ব তিনহাজার বছর এবং তার পরবর্তী আরও কয়েকশ বছর ধরে সমাজের এবং সেই সঙ্গে ধর্মের রূপান্তর হয়েছে এবং পৃথিবীর দুর্বলচিত্ত মানুষেরা এই ধর্মকেই ধ্রুব সত্য বলে মেনেছেন।

মুসলমানদের মধ্যে শুকরের মাংস খাওয়া নিষেধ। এটি আসে ইহুদিদের বিধিনিষেধ থেকে। ইহুদিরা ছিল যাযাবর, তাদের শত্রুরা কৃষিজীবী ছিল, তারা বাড়িতে শুকর পুষত। শত্রুদের গৃহপালিত জন্তুকে ঘৃণা করবার প্রবণতা থেকেই ইহুদিরা শুকরের মাংসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলো। লিঙ্গ মুণ্ডচ্ছেদ (খৎনা) করবার নিয়মটিও ইহুদি সমাজে প্রচলিত ছিল। এই নিয়মটি অতঃপর খ্রিষ্টান এবং অতঃপর মুসলমানরা গ্রহণ করেছে। এমন আরও সহস্র বিধিনিষেধ ও আচার ব্যবস্থা গ্রহণ করবার পর কোরান শরিফে ঘোষণা দেয়া হয়েছে—'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদিগকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করিও না; তাহারা পরস্পরের বন্ধু এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহাদিগকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, সে তাহাদেরই একজন হয়ে যায় .... নিশ্চয়ই আমি কাফিরদের জন্য শিকল, গলার বেড়ি ও জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রাখিয়াছি।'

ইহুদিদের মধ্যে ঈশ্বরের ছবি আঁকা নিষেধ, যা ইসলাম ধর্মে যার অনুপ্রবেশ দেখি। ইসলামে শুরুর দিকে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের যথেষ্ট মর্যাদা দেয়া হত। পরে অবশ্য ইহুদি খ্রিষ্টানসহ সকল অমুসলিমদের বিরুদ্ধে ইসলাম চরম শত্রুতা শুরু করে এবং তাদের বিরুদ্ধে অশোভন বাক্য বলি ও হুমকি ছুঁড়ে দেয়। ধর্ম ও ঈশ্বরের নামে মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবার অর্থ একটিই—ধনিক গোষ্ঠির জন্য আরব অঞ্চলে একচেটিয়া আধিপত্য করা, ব্যবসা করা এবং নতুন রাজ্য দখল করবার সুযোগ তৈরি করা।

ধর্মের রহস্যজট ইচ্ছে করলেই খোলা যায়। যারা জটের মধ্যে জীবন জড়াতে চান তাঁরা জট খুলতে দেখলেই তেড়ে আসেন, এ তাঁদের অজ্ঞতা হতে পারে। অথবা অতিচালাকিও হতে পারে। কারণ, এই আধুনিক বিশ্বে ধর্মের ব্যবসা বেশ জমজমাট। কে এর থেকে স্বার্থ আদায়ে ব্যস্ত, কে নয়—তা বোঝা দুষ্কর। শেষ পর্যন্ত যে কোনও আধুনিক মানুষের উচিত মানবতার ধর্মকেই সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম বলে গ্রহণ করা।

খবরের কাগজ, ঢাকা।

দুর্মুখরা কত কথাই বলে। এদের কথায় কান দিতে নেই। আমি দিইও না। কান দিলে ওদের জিভে যে ব্যাকটেরিয়া থাকে, সেই ব্যাকটেরিয়া আমার কানে ঢুকে কান পচিয়ে দেবে। কিন্তু সব কিছুর তো একটা সীমা আছে, সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দুর্মুখরা। অনেকদিন থেকে আমি লক্ষ করছি আমি ভাল লিখি এতে হয়ত অনেকের আপত্তি নেই, আপত্তি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। তাছাড়াও আমার লেখা যারা পছন্দ করে না, তারা, লেখা যারা পছন্দ করে তাদের সঙ্গে যখন তর্কে মাতে, তখন একটি কথাই সবচেয়ে বেশি টানে যে আমি এতো বেশি বিয়ে করেছি কেন? (এই বিয়ের সংখ্যা নিয়ে লোকের মধ্যে নানারকম মতভেদ আছে। কেউ বলে তিন, কেউ বলে চার, কেউ পাঁচ, কেউ সাত)। বিয়ের সংখ্যা কত, এবং কি নাম আমার প্রাক্তন স্বামীদের .. এ নিয়ে লোকের উৎসাহের সীমা নেই। যারা আমার লেখার একটি অক্ষরও কখনও পড়েনি, তারাও লোক-মুখে শোনা আমার স্বামীদের নাম চেঁচিয়ে বলে। লোকমুখে শোনা এই জন্য বলছি যে আমি কোনও দিন কোথাও বলিনি বা লিখিনি কাকে বা কাদের আমি বিয়ে করেছিলাম। যাদের নাম আমার স্বামী তালিকায় দেওয়া হয়, তারা কি আসলেই আমার স্বামী ছিল? তাদের সঙ্গে আমি কি কখনও বসবাস করেছি? এর উত্তর কিন্তু আমিই জানি কে আমার স্বামী ছিল, কার সঙ্গে আমি বাস করেছি স্ত্রী হিসেবে।

আমার লেখা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে লোকে আমার বিয়ে নিয়ে মাথা ঘামায়। বিয়ে ব্যাপারটি আমার নিতান্তই ব্যক্তিগত। আমিই জানি কবে কার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক হয়েছে এবং সেই সম্পর্ক কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে। আমি ছাড়া আর কারও কি সাধ্য আছে এসব জানে? অথচ পত্রিকাগুলোর ভাব দেখে মনে হয় তারাই বেশি জানে আমার চেয়ে। এমন লোকের নামও আমার স্বামী হিসেবে প্রচার হয়, যাকে আমি আদৌ চিনি না।

আমি প্রায়ই ভাবি এসবের কারণ কী? লোকের এত উৎসাহ কেন, কার সঙ্গে আমি ঘুরেছি, কার সঙ্গে শুয়েছি এসবে? আমি যার সঙ্গেই শুই, যে বিয়ে করে হোক, বিয়ে না করে হোক, সে একেবারেই আমার নিজস্ব ব্যাপার। শারীরিক ব্যাপার। শারীরিক ব্যাপারগুলো, আমি যতদূর জানি, যার যার নিজস্ব। ব্যক্তিগত। মানুষ মানুষকে ভালবাসে, সম্পর্ক স্থাপন করে। এ মানুষের অন্তর্গত নিয়ম। তবে দেখতে হবে কেউ কারও কোনও ক্ষতি করছে কি না। আমি জানি, আমার কাছের অনেক মানুষই জানে, আমি কারও কোন ক্ষতি কখনও করিনি, বরং স্বামী নামক কিছু নাম যে আমার নামের পাশে লেখা হয়, তারাই বিভিন্ন কায়দায় বিভিন্ন ভাবে আমার ক্ষতি করে গেছে, আমাকে অপমান করে গেছে। যেহেতু নিজেকে অপমানিত হতে দিতে আমি চাই না, সম্পর্ক ছেদ করতে হয়েছে আমাকে। লোকের কথায় মনে হয় কারও সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ না হলে তারা খুব খুশি হত, অর্থাৎ আমি যদি অপমানিত হতে হতে যদি তিল তিল করে মরে যেতাম, তারা বলতে পারত মেয়ে খুব চরিত্রবতী। পুরুষের অন্যায়ের কাছে নিজেকে বলি হতে দিলে সকলে আমাকে লক্ষ্মী মেয়ে বলবে সে আমি জানি, কিন্তু নিজেকে হত্যা করে আমি এইসব লোককে খুশি করতে মোটেও রাজি নই। এতে আমার কিছু

যায় আসে না। আমার স্বামী হিসেবে যাদের নাম প্রচারিত হয় তাদের কাউকে কাউকে আমি চিনি, তবে একথা সত্য এদের সঙ্গে আমার মানসিক এবং শারীরিক দূরত্ব সব সময়ই খুব বেশি ছিল, আমার সঙ্গে যার অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক তার নাম এখনও প্রচারকদের অভত হাতের কবলে পড়েনি, এ বোধ হয় আমরই জয়।

তাদের স্বরচিত কায়দায় তারা শুয়োরের মত ঘোৎ ঘোৎ করছে, করুক। তবে এই ঘোৎ ঘোৎ শব্দ এত বিকট হয়ে উঠেছে যে আমি আশংকা করি এই সমাজে কি মেয়েরা কখনও মানুষের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে? আমাকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে মৌলবাদীরা এবং 'পুরুষ'রাও বটে। আমি তাদের অপপ্রচারে, অপমানে এতটুকু কাতর হব না। আমি দাঁড়াবই মনুষ্যত্ব, মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদ নিয়ে। অজ্ঞতা যখন চারিদিকে প্রকট হয়ে ওঠে, তখন কথায় নয় কাজে মন দেওয়াই ভাল। মানুষের মঙ্গলের জন্য কিছু যদি করে যেতে পারি, মেয়েদের ভোঁতা মস্তিষ্ক যদি সামান্য হলেও তীক্ষ্ণ তীব্র প্রতিবাদী করতে পারি, তবেই আমার ভেতরের দহন কমবে। এই নষ্ট সমাজে মেয়েরা যদি নিজেকে আর অপমানিত হতে না দেয়, আমি স্বস্তি পাব। না হয় নিজে সব দুঃখ শোক, দুঃসহ যন্ত্রণা আর অসুখ সয়ে অন্যকে সুখ দিয়ে গেলাম। না হয় নিজে সব দুর্যোগ মাথায় নিয়ে অন্যকে নিশ্চিন্তি দিয়ে গেলাম। অপবাদ অকল্যাণ নিজের ভাগে নিয়ে অন্যের ভাগে আমি সব কল্যাণ দিতে রাজি। আমার থোকা থোকা কষ্ট নিয়ে লোকে আজ উল্লাস করছে, পত্রিকাগুলো এ নিয়ে বাণিজ্যও করছে কম নয়, কিন্তু আশা করতে ক্ষতি কী আমি পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হয়েছি, আমাকে ছুঁয়ে আর কেউ অগ্নি হোক; আমি পথ হই নারীর পদতলে। তবু তারা দাঁড়াতে শিখুক, হাঁটতে শিখুক।

খবরের কাগজ, ঢাকা।

আমি বিশ পঁচিশ জনের মিছিলের পেছনে দুট্রাক পুলিশ যেতে দেখেছি এই শহরে। আর এই শহরেই জন্মাষ্টমির পঁচিশ হাজার মানুষের একটি মিছিলের সামনে পেছনে পুলিশ ভ্যান ছিল দুটো। মিছিলের তুলনায় পুলিশ নিশ্চয় যৎসামান্য। এই মিছিলে খুব কমান্ড এবং ফিরেপিত্র লাঠিয়াল বাহিনী আক্রমণ করেছে, মেয়েদের শাড়ি খুলে নিয়েছে, কারও ২-৪ও মাথা ফাটিয়েছে, কৃষ্ণ সেজেছিল যে শিশুটি তারও মাথা ফেটেছে। মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। চোখের সামনে কী সব বীভৎস কাণ্ড ঘটে যায়, আর আমরা এইসব বীভৎসতার বিরুদ্ধে একত্র না হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাই। আমরা ছড়িয়ে গিয়ে ভয়ে মুখ লুকোই যার যার ঘরে। যেন আমাদের পিঠে সরকারি সন্ত্রাসীদের লাঠি না পড়ে। আমরা বোধহয়, যারা ভাল ভাল কথা বলছি পত্রিকায়, সভা সেমিনারে—তারা ভাল পিঠ বাঁচাতে জানি। পিঠ বাঁচাতে জানি বলেই অসাম্প্রদায়িক লোক এদেশে বেশি থাকলেও আমরা একত্র হতে পারি না। আমরা একশ মানুষ দশজন লোকের ভয়ে পিছু হটি। একশ জন সন্ত্রাসীর রামদা কিরিচ আর লাঠির ভয়ে দৌড়োই দশ লাখ যুক্তিবুদ্ধিবিবেকবান মানুষ।

যদি একই রকম আরেকটি মিছিলের কথা ভাবি, জুলুসে জুলুসের মিছিল। এটিও তো একজনের জন্মোৎসব, জন্মাষ্টমী যেমন। হযরত মুহম্মদের জন্মোৎসবের মিছিলেও যদি এমন হামলা হয়, সেই মিছিলের টুপিবাহিনীর টুপি খুলে, পাজামা পাঞ্জাবি খুলে নেয় অন্য মানুষেরা, তবে? চড় যে দেয়, তার আসলে জানা উচিত চড় খেলে কেমন লাগে। আসলে তাদের দোষ দিয়েই বা কী লাভ? কোরানে আছে বিধর্মীদের সঙ্গে মেশো না, বিধর্মীদের সঙ্গ ত্যাগ কর। কোরানের এই উপদেশ তো তাদের মানতেই হবে। তাই তারা ছলে বলে কৌশলে বিধর্মীদের আঘাত করছে। ধর্মভিত্তিক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত এবং সেক্যুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত সভ্যতা এবং সাম্য অর্জন সম্ভব হবে নয়।

অনেকে বলে হিন্দুরা ভারত চলে যাচ্ছে কেন, তারা এদেশে থাকবে এবং লড়াই করে বাঁচবে। ভারতে যেমন সংখ্যালঘু মুসলমানরা লড়াই করছে, তেমন। এ স্রেফ বাজে কথা। সংখ্যালঘুরা সে দেশেই লড়াই করতে পারে, যে দেশে সেক্যুলারিজম আছে। একটি সেক্যুলারিজম রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যে কোনও মিছিল বা যে কোনও দাবি নিয়ে পথে নামতে পারে। তাদের আন্দোলনের একটি ইতিবাচক দিক আছে। কিন্তু একটি বিশেষ ধর্ম, রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে বহাল থাকলে সেই বিশেষ ধর্মের লোকেরা চিরকালই বিশেষ ধর্ম যারা ধারণ না করে তাদের মাথায় লাঠি মারবে, তাদের প্রকাশ্যে ন্যাংটো করবে, তাদের ঘরবাড়ি লুট করবে, তাদের দোকান পাট ভেঙে, পুড়িয়ে দেবে। দেবেই—কারণ রাষ্ট্র তাদের আশকারা দিচ্ছে। রাষ্ট্রের আশকারা পেয়ে ক্ষমতাবান ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। আমি আশ্চর্য হই, জন্মাষ্টমী মিছিলে যারা আক্রমণ করেছিল, তাদের কাউকে পুলিশ গ্রেফতার

করেনি, লোক দেখানো গ্রেফতারও করেনি। সরকার যদি স্বীকারই করছে জন্মাষ্টমীর মিছিলে হামলা হয়েছিল তবে একটি হামলাকারীও কেন ধরা পড়েনি? রাষ্ট্র আমাদের আর কত লজ্জা দেবে? লজ্জায় আমাদের মুখ লুকোতে হয়, লজ্জায় আমরা শামুকের মত গুটিয়ে থাকি। যারা এই রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক বলে ভাবে, তাদের ধিক্কার দিই আমি, ধর্মনিরপেক্ষতা গণতন্ত্রের প্রথম শর্ত, এই শর্ত পূরণ না হলে গণতন্ত্রের নাম ধারণ করবার অর্থ জাতিকে বোকা বানানো। স্বৈরাচারের একটা সীমা আছে। এই সরকার সেই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এক স্বৈরাচারির বিরুদ্ধে নব্বই-এ যে গণ জাগরণ হয়েছিল, তেমন একটি জাগরণের প্রয়োজন এখন। একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রের জন্য আমাদের সবার এখন পথে নামা জরুরি।

খবরের কাগজ, ঢাকা।

অনেকদিন পর একটি নাটক দেখলাম সেদিন। নাটক আমার দেখাই হয় না আজকাল। সময়ও হয় না, দেখে ভালও লাগে না। ভাল না লাগার কারণ অনেক। যে নাটক দেখে এই লেখা লিখছি, নাটকটি আমাকে মুগ্ধ করেছে বলেই লিখছি, নাটকের নাম বিষাদ সিন্ধু। ইওরোপীয় নাটকের ফর্ম, আমাদের লোকনাট্যের স্বাদ, মুসলিম মিথ — এসব এক করে নাটকটিকে যে কথা বলা হয়েছে, তা হল জ্ঞানের সন্ধান করা মানব জনম সার। এখানে হাসান হোসেন থেকে শুরু করে মুহম্মদ পর্যন্ত কেউই পুত পবিত্র মানুষ নন। সকলেই দোষে গুণে লোভে মোহে হিংসায় এজিদ মাবিয়ার মতই অর্থাৎ অন্ধকার সমাজের আর সব মানুষের মতই। আর যুদ্ধ নয়, মৃত্যু নয়, মনুষ্যত্বের যেন জয় হয় এটিই নাটকটির সার সংবাদ।

উৎপল দত্তের একটি নাটক দেখেছিলাম, জনতার আফিম। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে এমন অসাধারণ নাটক আমি আর দেখিনি। এতে হিন্দু ধর্মের ফাঁকিবাজি ভন্ডামো সব ফাঁস করে, ধর্ম নিয়ে যারা ব্যবসা করে তাদেরও তুলে আছা আছাড় দেওয়া হয়েছে। ওখানে আছাড় দেওয়া যায়, এখানে মুখ খোলা যায় না, মুখ খুললে ব্যয়তুল মোকাররমে মিটিং হয়, মসজিদে লিফলেট বিলি হয়, ইনকিলাবে বা সংগ্রামে পোস্ট এডিটোরিয়াল লেখা হয়, ফাঁসির দাবি ওঠে। আমরা এমনই এক অজান অন্ধকারে বাস করছি, এমনই এক শ্বাসরুদ্ধকর সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি যে বিষাদ সিন্ধু যে হাসান হোসেনের জন্য বিলাপ ছাড়া আর কোনও সত্য উচ্চারণ করতে পারে—তা আমার আগে বোধ হয়নি; ভাল নাটকের আকাল পড়েছে দেশে, সেদিনও বাংলাদেশের ঈর্ষা নাটক দেখে বেশ কজন আহত কণ্ঠে আমাকে বলেছে—'একটি মেয়ে নিয়ে দুজন পুরুষ টানা হেঁচড়া করল, তাই বেশ মজা করে দেখানো হল, মেয়ে যেন একটুকরো মাছ বা মাংস যে থাবা দিয়ে ধরে খুব ক্ষুধার্ত পুরুষ মানুষদের এক্ষুণি খেতে হবে'। বিষাদসিন্ধুতে হাসানের মৃত্যু নিয়ে একটু বেশি আহাজারি হয়েছে, এটুকু না হলেও চলত, ফাঁকে ফাঁকে আরও একটু জ্ঞানের সন্ধান হলে আমার আরও মন ভরত। এটি নাটকের কোনও ত্রুটি নয়, এ আমার প্রস্তাবনা। জায়েনাকে ডাকিনী নাগিনী না বলে তার ক্রোধকে যৌক্তিক বলবার ক্ষেত্র ছিল।

যে কোনও ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন করা যায়, কেবল ভুডাইজম এবং ইসলাম নিয়ে কোনও প্রশ্ন চলে না। ইসলাম বলে— বিশ্বাস করতে হবে অন্ধের মত, আল বাকারায় লেখা— 'তাদের হৃদয় আমি মোহর করিয়া দিয়াছি।' আল্লাহ যদি মোহর করেই দেন হৃদয়, তবে জ্ঞানের সন্ধান হবে কী করে, আর জান না বাড়লে মনুষ্যত্বের জয় কী করে হবে। যুক্তির সঙ্গে আপস মানুষকে একদিন না একদিন করতেই হবে। অন্ধকারে পড়ে থাকা কোনও বীরত্ব নয়। প্রশ্নহীন বিশ্বাস মানব মুক্তির উপায় নয়। বিষাদ সিন্ধু নাটকে যা সবচেয়ে বেশি ভাল লেগেছে আমার, তা হল— মঞ্চে ঢুকেই বলা হয় 'প্রথমে বন্দনা করি সৃষ্টিকর্তা পরম প্রকৃতির।' প্রকৃতিকে সৃষ্টিকর্তা মেনে নাটকের এই যাত্রা, আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় করেছে যে, এখনও মানুষ সত্য

বলতে আগ্রহী, পরিবেশ প্রতিকূল তা জানি. এই আনন্দে মহিলা সমিতির দেড়'শ দু'শ মানুষের মধ্যে আবদ্ধ না করে ছড়িয়ে দেওয়া হোক। অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে কবে মুক্ত হবে মানুষ, জানি না। কিন্তু সত্যকে প্রকাশ করতে চাই, অথবা সন্ধান করতে; আমরা যারা মানুষের জয় চাই, আমরা যারা যে কোনও প্রশ্ন সামনে আনতে চাই, একই সঙ্গে যুক্তির উত্তরকে— আমরা যেন সংগঠিত হতে পারি, এক প্লাটফর্মে না দাঁড়ালে কে কোথায় পড়ে আছি সত্যাগ্রহী মানুষেরা, কেউ কারও ঠিকানা জানি না। ওরা তলে তলে উপড়ে নিচ্ছে আমাদের চোখ, কেড়ে নিচ্ছে কথা বলবার অধিকার। বোবা কালা বোধহীন যুক্তিহীন মানুষে একদিন দেশ ছেয়ে যাবে আর জয় হবে তাদের, মূর্খ মস্তান মোল্লাদের। জয় হবে জ্ঞানহীনতার, অসত্যের, অন্যায়ের।

এখনও সময় আছে আমাদের শক্তিমান হাত প্রসারিত করতে মঙ্গল কামনায়। এখনও সময় আছে পাঠক, যদি মানুষ হোন, মানুষের জন্য একবার একত্র হোন।

খবরের কাগজ, ঢাকা

ইনশাল্লাহ, মাশাল্লা, খোদা হাফেজ ....

কথায় কথায় এদেশের বাঙালি মুসলমান বলে—ইনশাল্লাহ। যেমন— এই কাজটি আমি করব ইনশাল্লাহ। কাল আমি যাব ইনশাল্লাহ। বাঙালি মুসলমান মাশাল্লাও কম বলে না। তোমার একটি ছেলে হয়েছে মাশাল্লা। পরীক্ষায় ভাল করেছ মাশাল্লা। আর বিদায় বেলায় অবধারিত এসে যাচ্ছে— খোদা হাফেজ। স্লামালেকুম তো কেবল বাঙালি মুসলমান নয়, এদেশের বাঙালি হিন্দুও হামেশা বলে।

কিন্তু কেন বলে? কথায় কথায় আল্লাহকে দৈনন্দিন শব্দ ব্যবহারে নামিয়ে আনবার কী কারণ থাকতে পারে! যারা নামাজ রোজা করে না, "আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ" পালন করে না, তারাও দেখেছি ইনশাল্লাহ, মাশাল্লা, খোদা হাফেজ বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেলছে। এ আসলে কার সঙ্গে প্রতারণা? নিজের সঙ্গে নয়? তথাকথিত সভ্য শিক্ষিত মানুষ নিজের সঙ্গে প্রতারণা করছে। এবং করেই যাচ্ছে। তাদের বোধ এবং বিশ্বাসের সঙ্গে যদিও এই শব্দগুলো কিছুই মিলছে না, তবু। যারা বিশ্বাস করে ইনশাল্লাহ, মাশাল্লা বললে তাদের কিছু পূণ্য হবে, তাদের কথা আলাদা। আমি তাদের গণনায় ধরি না। কারণ তাদের দ্বারা ক্ষতি ছাড়া কখনও লাভ হবে না।

কিন্তু যাদের জীবনে ধর্মচর্চার বালাই নেই, তাদের তো অন্তত আরবি শব্দের ধর্মীয় মোহ বাদ দিয়ে বাংলা শব্দ ব্যবহার করা উচিত। আমি কখনও ইনশাল্লাহ, মাশাল্লা শব্দ ব্যবহার করি না। আমি বলি— এই কাজটি আমি নিশ্চয়ই করব। নিশ্চয়ই থাকলে ইনশাল্লাহর প্রয়োজন পড়ে না। এবং কোনও সুসংবাদ শুনে আমি মানুষকে 'অভিনন্দন' জানাই, মাশাল্লা নয়। 'খোদা হাফেজ'- এর অর্থ খোদা তোমার হিফাজত করুন। এই কথা মানুষের বিদায় বেলায় প্রযোজ্য হবার কোনও কারণ আছে? খোদা কি আসলে কারও হিফাজত করেন?

সন্দেহ বাদীরাই এক কথা বারবার উচ্চারণ করে ঘুরে ফিরে। প্রতি পাঁচটি বাক্যে যাঁরা আল্লাহ নাম একবার উচ্চারণ করে, তাদের নিশ্চয়ই সন্দেহ হয় আল্লাহ বলে আদৌ কিছু আছে কিনা। কারও বিদায় বেলায় আমি 'আবার দেখা হবে' বাক্যটি বলতে পছন্দ করি। যে কোনও শুভ বিদায়ে এই বাক্যটি অত্যন্ত মানবিক, আন্তরিক। 'আসসালামু আলায়কুম' আরবি শব্দ— এর অর্থ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। 'আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক' বাক্যটিকে ভিন্ন ভাষায় উচ্চারণ করতে হবে কেন— আমাদের বাংলা ভাষা কি এতই দীন,হীন,এতই দরিদ্র?

আমি কারও সঙ্গে দেখা বা পরিচয় হলে'আসসালামু আলায়কুম' বলি না। বলি- 'শুভেচ্ছা', 'কেমন আছেন', 'ভাল আছেন তো' অথবা 'সুপ্রভাত', 'শুভ সন্ধ্যা' ইত্যাদি। আমি দৈনন্দিন শব্দ ব্যবহারে বিদেশী বাক্যের আশ্রয় নিই না। নিতে পছন্দ করি না। দেশের চোর, ডাকাত, খুনী, চোরাকারবারিও সন্ত্রাসীরা তাদের দিন শুরু করে 'আল্লাহ' দিয়ে, শেষ করে 'আল্লাহ' দিয়ে। আল্লাহর নাম নেয় বলে তারা 'মহৎ মানুষ'— একথা ঠিক নয়। আর আল্লাহর নাম আমার জীবনাচারে অনুপস্থিত বললেই চলে, বুদ্ধি হবার পর শ্রদ্ধাভরে এই নামটি আমি স্মরণ করিনি, তাই বলে আমি কিন্তু অসৎ, অমানবিক, অনুদার নই মোটেও। আমি যুক্তিবাদী, সহনশীল ও উদার হতে পারি আমার স্বভাবের সৎ গুণে।

ইনশাল্লাহ্ মাশাল্লা, সোবহানআল্লাহর ব্যাপক ব্যবহার দ্বারা আর যাই হোক মানুষের কোনও উপকার হয় না একথা আমি স্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করতে পারি। বিজ্ঞান বা প্রগতির সঙ্গে এই শব্দগুলোর আদৌ কোনও সম্পর্ক নেই। তাই বিদেশী এবং অনর্থক শব্দগুলো বিজ্ঞানসম্মত মানুষেরা বর্জন করতে পারেন অনায়াসে।

আজকাল টেলিফোনেও এই উপদ্রব শুরু হয়েছে। প্রায়ই অপর প্রান্ত থেকে বলা হয়— 'হ্যালো স্লামালেকুম', হ্যালো শব্দটির সঙ্গে স্লামালেকুম শব্দও যেন আঠার মত জড়িয়ে আছে। ভিন্ন ভাষায় সম্ভাষণ জানাবার রীতি কি আমাদের সমাজে তৈরী হয়েই যাচ্ছে? বাঙালি মাত্রই এই প্রবণতাকে বন্ধ করা উচিত। বন্ধ করা উচিত কারণ ধর্মের চেয়ে সংস্কৃতি বড়। অশিক্ষিত মানুষের সংস্কৃতি হচ্ছে ধর্ম এবং শিক্ষিত মানুষের ধর্ম হচ্ছে সংস্কৃতি। আমরা নিশ্চয়ই অশিক্ষিত হতে চাই না।

শিক্ষকদের স্লামালেকুম নিয়ে ভাইবা পরীক্ষায় বসিনি বলে আমার মার্কস কাটা গিয়েছিল মেডিক্যাল কলেজের ফাইনাল পরীক্ষায়। স্লামালেকুম বলিনি বলে শিক্ষকদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা কিছু কম ছিল তা কিন্তু নয়। বরং অনেকের চেয়ে অনেক বেশিই ছিল। ভাইবা বোর্ড থেকে বেরিয়ে আমার মনে আছে সেই ছাত্রটি এক শিক্ষককে 'হারামজাদা' বলে গাল দিয়েছিল, যে ছাত্রটি অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে সেই শিক্ষককে স্লামালেকুম বলেছিল। আমি আঁতকে উঠেছিলাম তার অশোভন উক্ত শুনে। ভাইবায় সেই ছাত্রের মার্কস কাটা যায়নি বরং ভদ্রতার জন্য কিছু বেড়েছিল বোধহয়। আমি শিক্ষককে স্লামালেকুম দেব না, তাঁকে বড় শ্রদ্ধা করব, আমি তাঁর কোন ক্ষতি করব না, গাল দেব না, অশোভন উক্তি ছুঁড়ব না। কিন্তু ছাত্রটি তাঁকে 'স্লামালেকুম' দেবে আবার তাকে গালাগালও করবে, অশ্রদ্ধা করবে, সুযোগ বুঝে লাথিও দেবে—তবে কে সত্যিকার ভদ্র? আমি না সেই ছাত্র?

আল্লাহ খোদার নাম মুখে মুখে ফেরে আজকাল। এতে আল্লাহর কোনও মঙ্গল হয় না। মঙ্গল হয় না তারও, যে বলে। আসলে সৎ হতে হয়, বিবেকবান হতে হয়, উদার, সহনশীল, যুক্তিবাদী হতে হয়, তবেই সত্যিকার মঙ্গল হয় মানুষের, আর মানুষের মঙ্গল মানে মানবজাতির মঙ্গল।

খবরের কাগজ, ঢাকা

ছাত্রীনিবাস সন্ধ্যায় বন্ধ করে ফতোয়াবাজ অধ্যাপকেরা

সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টো ছাত্রীনিবাসের প্রাধ্যক্ষ ছাত্রীদের অভিভাবকদের কাছে চিঠি দিয়েছেন। চিঠিটি শুরু হয়েছে এভাবে—'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আবাস ও শৃংখলা অধ্যাদেশ-এর দ্বিতীয় পর্বের ৪নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে এবং বছরের বাকি সময়ে সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিটে ছাত্রীনিবাসের প্রবেশদ্বার বন্ধ করা হয় এবং হল কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতীত উল্লিখিত সময়সীমার পর ছাত্রীনিবাসের কোনও ছাত্রী ছাত্রীনিবাসের বাইরে থাকতে পারবে না। ছাত্রীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই এই নিয়ম দীর্ঘদিন যাবৎ চালু রাখা হয়েছে। কিন্তু ইদানিং কিছু ছাত্রী বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে ছাত্র ও ছাত্রীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে ছাত্রীনিবাসের প্রবেশদ্বার রাত ন'টা পর্যন্ত এবং কোনও কোনও সময় রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত খোলা রাখার দাবি জানাচ্ছে। ....' প্রথমেই অবাক হতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য হলে ফিরবার সময় বাঁধা হয়েছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, কিন্ডারগার্টেনের শিশু নয়। তারা রাস্তা হারিয়ে ফেলবে না, পথ পেরোতে গাড়ি চাপা পড়বারও চিন্তা নেই (সাধারণত শিশুদের জন্য যে ভয়টি থাকে), তারা প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে, নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। তাছাড়া তাদের যদি ইচ্ছে করে লাইব্রেরিতে লেখাপড়া করতে, যে লাইব্রেরি রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকে, যেখানে সহপাঠী ছেলেরা লেখাপড়া করতে পারছে; তাদের যদি ইচ্ছে করে কোনও বন্ধু অথবা বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে খোলা হাওয়ায় বেড়াতে? গল্প করতে? অথবা কারও সঙ্গেই নয়, একটি মেয়ের ইচ্ছে করতেই পারে একা একা সন্ধেটা হেঁটে বেড়াতে, কোথাও বসে ঘোঁয়া ওঠা চা খেতে, মানুষের জীবনে এ রকম ইচ্ছে হতেই পারে। মানুষ মুরগী বা গরু-ছাগল নয় যে সন্ধ্যা হলেই ওদের খোঁয়াড়ে ঢোকানো হবে। যদি ছেলেদের হলকে এরকম খোঁয়াড় বানানো হয় তারা কি মানবে? আমি নিশ্চিত তারা মানবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কি ছাত্রদের সমান মেধাবী নয়, তারা কি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু নিচু স্তরের লেখাপড়া করছে? নিশ্চয়ই নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে কারা? নিশ্চয়ই মেধাবী, সংস্কারমুক্ত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়েরা। তাদের সম্পর্কে এমন আপত্তিকর উক্তি করবার অধিকার কোনও প্রাধ্যক্ষের থাকা উচিত নয়। আমি একজন নারী, নারীর এই অপমান আমার গায়ে এসে লাগে। আমি মনে করি যে কোনও সুস্থ সচেতন নারীর জন্য এ এক চরম অপমান। ছাত্রীরা অজুহাত দেখায়, ছাত্র-ছাত্রীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে তারা দাবি তোলে ... প্রাধ্যক্ষের কথায় মনে হয় ছাত্র-ছাত্রীর সমান অধিকারের দাবি যেন খুব অন্যায় একটি ব্যাপার। যেন যারা এই দাবি তোলে তারা পাপী, তারা এই সমাজের চোখে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে অত্যন্ত গর্হিত কাজটি করে। প্রাধ্যক্ষেরা দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে বসে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবিকে বাঙ্গ করতে দ্বিধা করছেন না। চিঠিতে আরও লেখা 'ঢাকায় চাকরি করা অথবা টিউশনি করে ফিরতে দেরী হওয়া, ছেলেদের ন্যায় রাত্রি পর্যন্ত লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ইত্যাদি কারণ হিসেবে দেখানো হচ্ছে। অথচ বিগত বেশ কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদানের নাম করে রাত দশটা-বারোটা পর্যন্ত

হলের বাইরে থাকা এবং অনুষ্ঠানে না গিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত লোকালয়ের বাইরে আবাসিক এলাকায় আনাচে-কানাচে একলা বসে সময় কাটানোতে ব্যস্ত থাকে। আবাসিক এলাকায় এসব কর্মকাণ্ড চোখে পড়লে ক্যাম্পাস কমিটি বেশ কিছুদিন আগে লিখিতভাবে আপত্তি জানিয়েছে। চাকায় টিউশনি করা, লাইব্রেরিতে পড়াশেষা করা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবার অধিকার যেমন ছাত্রীদের আছে, তেমন অধিকার আছে কারও সঙ্গে নির্জনে বসে আবাসিক এলাকার বাইরে গিয়ে প্রকাশ্যে অথবা আনাচে-কানাচে বসে বন্ধু বা প্রেমিকের সঙ্গে গল্প করবার। তাদের কেন বিভু একটার 'নাম করে' বাইরে যেতে হবে, কেন তাদের যেখানে খুশি সেখানে যাবার অধিকার থাকবে না? লোকালয়ের বাইরে আবাসিক এলাকায় আনাচে-কানাচে বসে গল্প করাকে অত্যন্ত ঘৃণাভরে দেখছেন কর্তৃপক্ষ। মেয়েদের যদি ইচ্ছে করে কারও সঙ্গে আনাচে-কানাচে বসে গল্প করতে, তবে কেন কর্তৃপক্ষ বাধা দেবেন? তাঁরা কি ছাত্রদের কোনও আনাচে-কানাচে যেতে বাধা দেন? আমি মনে করি ছাত্রীদের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার অধিকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নেই।

ছাত্রীদের নিরাপত্তা কারা বিঘ্নিত করে? ছাত্ররা? যদি ছাত্ররা ছাত্রীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, প্রথম জানতে হবে এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কর্তৃপক্ষের কাছে কোনও অভিযোগ করেছে কিনা। যদি না করে থাকে তবে কি কর্তৃপক্ষ আগ বাড়িয়ে তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছেন? যদি অভিযোগই ওঠে যে, ছাত্রদের কারণে ছাত্রীদের নিরাপত্তা নষ্ট হচ্ছে, এর প্রতিকার কি ছাত্রীনিবাস সন্ধ্যে বেলায় বন্ধ করে দিয়ে করা উচিত? নাকি অভিযুক্ত ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া উচিত? আমি নিশ্চিত যে কোনও বিবেকবান যুক্তিবাদী মানুষই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়াই সংগত বলে মনে করবেন। অথবা ছাত্র না হয়ে অন্য কোনও বহিরাগত সন্ত্রাসী দ্বারা যদি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় আমি মনে করি, কর্তৃপক্ষের উচিত হবে নিরাপত্তা বিঘ্নকারীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া। এই সমস্যার সমাধান ছাত্রীদের খোঁয়াড়ে পুরে হবে না। হওয়া সম্ভব নয়।

আমি শুনেছি বিজ্ঞান শাখার ছাত্রীরা ল্যাবরেটরিতে কাজ করে এসে বা পরীক্ষার আগে আগে লাইব্রেরিতে পড়াশেখা করবার প্রয়োজন অনুভব করে কিন্তু তাদের পক্ষে এ কাজ সম্ভব হয় না, যদিও ছাত্রদের বেলায় তা সম্ভব। ছাত্রীরা যদি লাইব্রেরিতে যেতে চায় তাদের লিখিত অনুমতি নিতে হয় হল কর্তৃপক্ষ থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য এই হয়রানির কোনও অর্থ হয় না। ছাত্রীদের দ্বারা এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও অঘটন ঘটেছে বলে শুনিনি। কিন্তু যে ছাত্রদের দ্বারা ঘটেছিল, তারা বহাল তবিয়তে আছে, তাদের হলে ফিরবার কোনও সময় বেধে দেয়া হয়নি। যারা অনিষ্ট করে না, তাদেরই পোরা হচ্ছে বন্দিশালায়। নিরাপত্তার নামে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি নিরাপত্তার নামে মেয়েদেরই বন্দি করবার ব্যবস্থা নেন, তবে কি এরকমই নিয়ম হওয়া উচিত যে, সব নিরীহ এবং নির্যাতিতদের বন্দি করে সন্ত্রাসী এবং নির্যাতনকারীদের ছেড়ে দেয়া উচিত সমাজে? এতে কি মূল সমস্যা সমাধান হয়?

ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে কর্তৃপক্ষ যত ভাবছেন, ছাত্রীরা তত ভাবছে না। কর্তৃপক্ষের উচিত ছাত্রদের যে সুবিধা দেয়া হয় একই রকম সুবিধা ছাত্রীদের দেয়া, ছাত্রীদের মেধা ও প্রতিভার সম্মান দেয়া, ছাত্রীদের মানুষ হিসেবে গণ্য করা— এসব না করে নিরাপত্তার ধুয়ো তুলে

উল্টো তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে—যা নিঃসন্দেহে মানবতা বিরোধী কাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে অভিভাবকদের সঙ্গে ছাত্রীদের হল বন্ধের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন ছাত্রীনিবাস প্রশাসন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। অভিভাবক ডেকে ছাত্রীদের বিরুদ্ধে তাঁরা কথা বলতে চান; কিন্তু যে দেশে অভিভাবকেরা মেয়েদের লেখাপড়াই করতে দিতে চান না, বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েরা রীতিমত সংগ্রাম করে পড়তে আসে, সেখানে অভিভাবকের কাছে ছাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা নিশ্চয়ই অভিভাবকদেরও উস্কিয়ে দেয়া। এর ফলে নিজেদের কন্যাদের তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে আর উৎসাহী হবে না। এ কি সমাজের জন্য ভাল হল না মন্দ?

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা, আপনারা আন্দোলন করুন। কেবল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নয়, কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসের জন্য যেন কোনও নির্দিষ্ট সময় না থাকে হলে ফিরবার। যেন কোনও কারণ দর্শাতে না হয়—কেন ছাত্রীরা বাইরে যাবে, কেন কারও ফিরতে রাত হবে। অঘটন যদি ঘটে সেটা দিনের বেলায়ও ঘটতে পারে। রাষ্ট্রের মানুষদের নিরাপত্তা দেবার দায়িত্ব সরকারের। প্রয়োজনে সরকারের কাছে সেই দাবি জানানো হবে, ছাত্রীনিবাস এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সেই দায়িত্ব নিয়ে মেয়েদের হলবন্দি করা মানে তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা নষ্ট করা। ছাত্রীরা নিজেদের অপমানিত হতে আর দেবে না, এ আমি আশা করি, বিশ্বাস করি। ছাত্রীনিবাস সন্ধ্যায় বন্ধ করবার ফতোয়া দেয় যে অধ্যাপক বা পরিচালকেরা, তাদের সঙ্গে মূলত কোনও পার্থক্য নেই দেশব্যাপী নারী হত্যাকারী ফতোয়াবাজ মওলানাদের। পার্থক্য একটিই, মওলানারা পরে পাজামা-পাঞ্জাবি টুপি, আর অধ্যাপকেরা পরে শার্ট প্যান্ট। দেখতে মানুষের মত লাগে, অথচ ভেতরে তারা সবচেয়ে অমানুষ।

আজকের কাগজ, ঢাকা

মসজিদের ইমাম ও গ্রামীণ মাতব্বরদের সালিশে সম্প্রতি সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া থানার বাদেকুশা গ্রামে পঁয়ত্রিশ জন নারীকে সমাজচ্যুত করা হয়েছে। এই চমৎকার সংবাদটি পত্রিকায় বেশ ফলাও করে ছাপা হয়েছে। সিলেটের ছাতকছড়া গ্রামে সেদিন নূরজাহানকে মেরে ফেলল মওলানারা। আর উল্লাপাড়ায় প্রায় মেরে ফেলার মতই সমাজের বাইরে ফেলে দেওয়া হল। পঁয়ত্রিশজন নারীর দোষ, তারা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল এবং গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ নিয়েছিল তাই তাদের সমাজচ্যুত হতে হল। মওলানারা ভেবেছে নারীরা পরিবার পরিকল্পনা করবে কেন? পরিবার পরিকল্পনা করা মানে আল্লাহর বিরোধিতা করা। আল্লাহ যদি ভ্রূণ দান করেন, সেই ভ্রূণকে জগতে আমন্ত্রণ না করবার কোনও অধিকার নেই মানুষের, বিশেষ করে নারীর। দেশে পরিবার পরিকল্পনা আন্দোলন বেশ জমজমাট, আর এই সময়ে পরিবার পরিকল্পনা করাই অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয় দেশেরই ভেতর এক গ্রামে। সরকার অনেক বছর থেকেই চিৎকার করছে পরিবার পরিকল্পনার জন্য অথচ উল্লাপাড়ার মওলানাদের সাহস কত বড় তারা সরকারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মসূচিকে এক ফতোয়ায় নাকচ করে দেয় এবং এই কর্মসূচি যারা পালন করে নিজের এবং সমাজের উন্নতি সাধন করছে তাদের একঘরে করছে, নির্যাতন করছে।

পঁয়ত্রিশজন আধুনিক মুক্তবুদ্ধির নারী এখন সমাজচ্যুত হয়ে দুঃখ দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছে। ওই গ্রামের মসজিদের ইমাম এবং মাতব্বরেরা যে রায় ঘোষণা করেছে তা ফেরাবার সাধ্য নেই সাধারণ মানুষের, ফেরাবার সাধ্য ছিল না ছাতকছড়া গ্রামের মানুষদেরও। ফেরাবার সাধ্য নেই উল্লাপাড়ার নিরীহ মানুষদের, সাধ্য নেই পঁয়ত্রিশ জন নারীর। তারা এক-গ্রাম মানুষের সামনেই বহিষ্কৃত হয়েছে, তারা এক গ্রাম মানুষের সামনেই সালিশী মেনে নিয়েছে। এছাড়া উপায় কি! এছাড়া উপায় আর কী আছে মেয়েদের? তারা এমনই নিরীহ জীব? তাদের ওপরই ধর্মের কুঠার উঁচু করে ধরা, তাদের ওপরই সমাজের ফতোয়া খাড়া। তাদের ওপর লাঙল চলে, তাদের ওপরই যত বুলডোজার। মওলানাদের ফতোয়া মেয়েদের ওপরই বর্ষিত হয় বেশি। কারণ মেয়েরা তো 'সব মেনে নেওয়ার জাত'। 'বুক ফাটে তো মুখ ফোটেনার জাত'। কিন্তু মেয়েরা কতদিন তাদের কল্লা পেতে দেবে বদমাশ মওলানাদের তরবারির নিচে? এই তরবারির নাম আসলে শয়তানি। মেয়েদের নিয়ে চারদিকে শয়তানি চলছে। মওলানারা শয়তানি করে মেয়েদের নিয়ে। আমরা আর কজন নূরজাহানের খবর পাই, কজন সমাজচ্যুত নারীর খবর আমরা পাই! দুএকটি যা খবর আসে তাই জানি, তাই নিয়ে ভাবি। তাই নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

পঁয়ত্রিশজন নারী এখনও কী সমাজচ্যুত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে? আমি জানি না। এই সমাজ এখন কাদের দখলে, এই সমাজ থেকে কারা সেই নারীদের বিচ্যুত করে? এই অধিকার তারা কোথায় পেল? কারা রাজত্ব করছে আজ দেশে? মওলানা আর মাতব্বরের নির্দেশে চলবে দেশ—একরকম কী ভেবেছিলাম আমরা কখনও? আমরা যারা সত্য, সাম্য আর সুন্দরের স্বপ্ন দেখতে শিখেছিলাম, আমরা যারা ধর্মনিরপেক্ষতা আর সমাজতন্ত্রের কথা বলতে শিখেছিলাম, তারা কী চোখের সামনে দেখেই যাব স্বাধীনতার বাইশ বছর পর আমাদের সুজলা সুফলা গ্রামে ধর্মের অসত্য শাসন?

বাংলাদেশ নিয়ে গৌরব করি, এ আমার দেশ। এ আমার পূর্বপুরুষের ভিটে মাটি। এ আমার শস্যের মাঠ, এ আমার ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়—এ আমার আকাশ, এ আমার স্নিগ্ধ বাতাস—এই ভরা ফসলের দেশে পঙ্গপালের মত নেমে আসছে মওলানাদের দাপট। গোলাম আযম একাত্তরে লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে খুন করে বিজয়ের ধ্বনি দিয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে আসে। একচোখা ড্রাকুলার মত তার দাঁত বের হয়ে আসে খুশিতে, অবাধ আনন্দে। অথচ এই কারাগারেই একজন রীমা হত্যা করে একজন মুনির ফাঁসিতে ঝুলছে, আর লক্ষ মানুষ হত্যা করে গোলাম আযম 'নিরপরাধ' প্রমাণিত হয়ে মুক্তি পায়। জেল গেটে তার জন্য অপেক্ষা করে অসংখ্য ঘাতক। এদের মধ্যে সেই মওলানারা বিরাজ করে যারা উল্লাপাড়ায় পঁয়ত্রিশ জন সংগ্রামী এবং কর্মঠ মেয়ের বিরুদ্ধে ফতোয়ার রাজনীতি করেছে, করেছে না বলে 'খেলেছে' বলা যায়, এরা তো আসলে মানুষ নিয়ে একরকম খেলছেই। পুতুল খেলা যাকে বলে। জনগণ তাদের হাতে পুতুল। তারা ধর্মের ভয় বা লোভ দেখিয়ে মজাদার খেলা খেলেই যাচ্ছে। ধর্ম যেন মওলানাদের মা বাপের সম্পত্তি। আলখাল্লা জোব্বা টুপি পড়ল, নামাজ পড়বার দাগ করে ফেলল কপালে, হাতে তসবিহগোটা নাড়ল চাড়ল—ব্যাস ধর্ম তাদের স্থাবর সম্পত্তি হয়ে গেল—এ কী মানা যায়?

এই খেলা আর খেলতে দেওয়া উচিত নয়। উল্লাপাড়ার সচেতন মানুষরা এই ফতোয়াবাজদের বরং সমাজচ্যুত করুন। কেবল উল্লাপাড়ায় কেন সারাদেশে যত ফতোয়াবাজ মওলানা আছে তাদের সমাজচ্যুত করবার দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করুক নতুন প্রজন্ম। ফতোয়াবাজ মওলানারা একদিন নির্মূল হবে এই বিশ্বাস আছে বলেই এখনও সম্ভবত বেঁচে আছি, এবং এখনও এই দেশ নিয়ে গৌরব করি।

খবরের কাগজ, ঢাকা

১. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একটি নিয়ম আছে, কোনও হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ক্লিনিক বা আবাবান ডিসপেন্সারিতে সরকারি চিকিৎসক তিন বছর অবধি থাকতে পারেন, তিনি না সরতে চাইলে তিন বছর আগে তাকে সরানো হয় না। তো, এক বছরের মাথায় শহরের হাসপাতাল থেকে অজপাড়া গাঁয়ের এক ডিসপেন্সারিতে পোস্টিং হওয়া একজন স্পেশালাইজড চিকিৎসক বিমর্ষ মুখে বসেছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বারান্দায়। এই বারান্দায় অনেক চিকিৎসকই ভিড় করেন, কারও সহায্য বদন, কারও বিমর্ষ। সহায্য তাঁদের, যাঁরা মন্ত্রীর জোর খাটিয়ে ঢাকার হাসপাতালে পোস্টিং পান। বারান্দায় বসে থাকা বিমর্ষ চিকিৎসককে প্রশ্ন করা হল—আপনার সমস্যা কি?

তিনি বললেন— তিন বছর থাকার রাইট ছিল একটি হাসপাতালে। সেখানে থেকে সরিয়ে দেয়া হল এক বছরের মাথায়।

কেন?

কারণ আমার 'কনজেনিটাল এনোমেলি' আছে তো, তাই।

'কনজেনিটাল এনোমেলি' মানে জন্মের পশুত্ব। আমি চিকিৎসকের আপাদমস্তক লক্ষ্য করলাম, তাঁর হাত, পা, বুক, পেট, চোখ, নাক, কান, ঠোঁট, আঙুল সবই স্বাভাবিক, তিনি খোঁড়া নন, কানাও নন। তবে তাঁর কোন অঙ্গ পশু একথা জানবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম—অ.পনার 'কনজেনিটাল এনোমেলিটি'টা কোথায়? আমি তো কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।

চিকিৎসক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—ধরতে পারছেন না? আমার—'অনিমেষ মিত্র'।

২. ভিখারুননেসা নুন স্কুল ও কলেজের এসেম্বলিতে জাতীয় সঙ্গীত গাইবার আগে সুর করে কোরানের সূরা পাঠ করা হয়। সূরা ফাতিহা এবং সূরা এখলাস। কেবল আরবিতে নয়, বাংলা এবং ইংরেজিতেও এগুলো পড়তে হবে তারপর জাতীয় ইংরেজিতেও এগুলো পড়তে হবে। তারপর জাতীয় সঙ্গীত। আগে ধর্ম, পরে দেশ। কিন্তু স্কুল কলেজের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান মেয়েদেরও যে এসেম্বলিতে এই ইসলাম ধর্ম গেলানো হচ্ছে, এর কারণ কি? যদি সূরা পাঠকে 'প্রেয়ার' বলে ধরে নেয়া হয় তবে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানের 'প্রেয়ার' কোথায়? নাকি এখন 'বিধর্মী'দের দল বেঁধে মুসলমান হয়ে যেতে হবে? প্রতি সকালে স্কুল কলেজের এই 'প্রেয়ার' সংখ্যালঘুদের পিঠে 'ইসলামি চাবুক' মাত্র, আর কিছু নয়।

৩. ধর্মীয় খাতে গত বছরের বাজেট ছিল অনুন্নয়ন খাতে—ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সাহায্য মঞ্জুরিঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা—১,৫০,০০,০০০০ টাকা। ওয়াক্ফ প্রশাসক মঞ্জুরি—৮,০০,০০০। অন্যান্য ধর্মীয় উদ্দেশ্য মঞ্জুরি—২,৮০,০০,০০০। জাকাত ফাণ্ড প্রশাসককে মঞ্জুরি ২,২০,০০০। ইসলামিক মিশন প্রতিষ্ঠান বাবদ ব্যয়—২,৫০,০০,০০০। সংখ্যালঘু সম্প্রদাযের জন্য আমানত তহবিল—২,৫০,০০০। মসজিদ বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ—১,২০,০০,০০০। বিনামূলে মসজিদে পানি সরবরাহ—৫০,০০,০০০। ঢাকা

তারা মসজিদ—৩,০০,০০০। বায়তুল মোকারম মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ—১৫,০০,০০০। প্রশিক্ষণ ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রম নিবিড়করণ ও প্রসারের জন্য মোট অনুন্নয়ন বরাদ্দ—১০,৯৩,৩৮,০০০। উন্নয়ন খাতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়-২০,০০,০০০। বাংলায় ইসলামিক বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশন— ২০,০০০। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রকল্প—১,৯০,০০,০০০। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা অনুবাদ ও গবেষণা কার্যক্রম ১,৫০,০০,০০০। মসজিদ পাঠাগার প্রকল্প—২৫,০০,০০০। নতুন জেলাশহরে ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সম্প্রসারণ, ইমাম প্রশিক্ষণ/ট্রেনিং একাডেমি—১,৫০,০০,০০০। মোট— ৫,৬৮,৫০,০০০। তারপর উপখাতে টাকা ভাগ হয়েছে ইসলাম ধর্মীয় অনুষ্ঠান/উৎসব উদ্‌যাপন ইত্যাদি—৫,০০,০০০। ইসলাম ধর্মীয় সংগঠনের জন্য কর্মসূচী ভিত্তিক সাহায্য মঞ্জুরি—২৮,৬০,০০০। মাননীয় সংসদ সদস্য/ সদস্যাদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন মসজিদ সংস্কার/ মেরামত ও পুর্নবাসনের জন্য—২,০০,০০,০০০। বিদেশে থেকে আগত ও বিশেদ গমনকারী ধর্মীয় প্রতিনিধি দলের জন্য ব্যয় বরাদ্দ—১০,০০,০০০। আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সংস্থা সংক্রান্ত চাঁদা-৬,৪০,০০০। নও মুসলমান, দুঃস্থ পুনর্বাসনের জন্য-১০,০০,০০০। মোট ২,৬৩,০০,০০০ (উৎস ধর্ম মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শাায় ২/প্র-৭/৯১-৯২ তাং ২৮-১১-৯১ ইং)

১৯৯১-৯২ সারে ধর্মীয় খাতের বাজেট বরাদ্দে দেখা যায় যে, উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ—১৬,৬২,১৩,০০০ টাকা। এর মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আমানত তহবিল হিসেবে মাত্র ২,৫০,০০০ টাকা। দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুর সংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি। আড়াই কোটি লোকের জন্য আড়াই লাখ টাকা বরাদ্দ হাস্যকর বটে। এই বাজেটর একটি উল্লেখযোগ্য দিক—'নও মুসলমান'দের পুনর্বাসন খাত। সংখ্যালঘুদের জন্য উন্নয়ন খাতে কোনও বরাদ্দ নেই কিন্তু নও মুসলমানদের জন্য আছে অর্থাৎ সংখ্যালঘু যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে তাদের টাকা পয়সা দেয়া হচ্ছে।

যায় যায় দিন, ঢাকা

জিজ্ঞাসায় ছাপা হওয়া 'আর রেখ না আঁধারে আমায় দেখতে দাও' রচনাটি যে প্রবন্ধ হয়নি এবং 'প্রবন্ধে যে পক্ষ বিপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যযুক্তির যোগ বিয়োগ কষে প্রতিপাদ্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়' যা ওই রচনাটিতে করা হয়নি, তা মেনে আমিও ওটিকে কেবল 'রচনা'ই বলেছি, রচনাকে প্রবন্ধ বলবার ধৃষ্টতা আমার নেই। রচনাটি 'তথ্য' 'যুক্তি' ও 'নিয়ন্ত্রণ করা ভাবোচ্ছ্বাসে' ঠাসা নয় এ কথাও স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।

যে দেশের আইনে নারীর মানুষের মর্যাদা নেই; বিবাহে, বিবাহ বিচ্ছেদে, সন্তানের অভিভাবকত্বে পুরুষ প্রাধান্যই প্রকট, যে সমাজে নারী পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত নয়, সেই সমাজ এবং দেশে বাস করে, এবং যে ধর্মের পাথর নারীর গায়েই ছোঁড়া হয়, যে ধর্ম বলে পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে নারীর জন্ম, যে ধর্ম বলে 'পুরুষ নারীর কর্তা, আল্লাহ তাদের এক-কে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন' (সূরা নিসা আয়াত ৩৩) সেই ধর্ম যখন রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, তখন যদি কোনও নারী শেকলবন্দি পা নিয়ে রচনা লেখে যে তার ইচ্ছে করছে ঘরের বাইরে বেরোতে তবে কি তা লিঙ্গবাদি হয়ে ওঠে? সে 'গোষ্ঠী আধিপত্য' প্রতিষ্ঠা করতে চায়? একটি খাঁচা বন্দি পাখি যখন উড়তে চায় এর মানে কি এই দাঁড়ায় যে সে কেবল নিজেই উড়বে, আর কেউ নয়? যারা আগে থেকেই উড়ছিল তাদের খাঁচাবন্দি করতে হবে? আমার মনে হয় যারা তাকে খাঁচায় আটকেছে তাদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করা খাঁচা-বন্দি পাখির পক্ষে স্বাভাবিক অবশ্য সে যদি বুঝতে পারে সে খাঁচায় আটকা পড়েছে, এই খাঁচা তার স্থান নয়, অনন্ত একটি আকাশ দাবি করবার অধিকার তার আছে।

রচনাটিতে ক্ষোভ আছে, ঘৃণাও কিছু কম নয়। আর যে কোনও সৎ ও সুস্থ মানুষেরই অত্যাচারির প্রতি ক্ষোভ এবং ঘৃণা থাকা যুক্তিসঙ্গত। এ কথা বলবার প্রয়োজন নেই নারীকে ঘর বন্দি করেছে কারা। কোন লিঙ্গবাদ তাকে ঠেলতে ঠেলতে হাঁড়িকুঁড়ির মধ্যে ঢুকিয়েছে, সন্তান তৈরির যন্ত্র বানিয়েছে, কোন লিঙ্গবাদ তার শরীরের সৌন্দর্যকে এবং তার স্বামী-সংসারে নিবেদিত হওয়াকে প্রধান গুণ বলে বিচার করে।

শেখ মিজান লিখেছেন 'একটি মাত্র মেয়ে দেখালেই হত যিনি কোনও একজন পুরুষের চেয়ে সবল, কঠোর, সাহসী এবং লজ্জাহীন।' তাঁর এ কথা লেখার কারণ এই, আমি লিখেছি, 'মেয়ে মাত্রই দুর্বল, কোমল ভীতু ও লজ্জাবতী নয়।' তিনি বোঝাতে চাইছেন 'মেয়ে মাত্র' বলতে সকল মেয়েকে বোঝায়, এতে তিনি একমত নন। একটা বা দুটি একসেপশান হতে পারে এবং এই একসেপশানের উদাহরণ তিনি দেয়েছেন। আমি কিন্তু এখানে পুরুষের সঙ্গে তুলনা করে মেয়ে মাত্র শব্দদুটো ব্যবহার করিনি। তিনি আগ বাড়িয়ে তুলনা চাপিয়ে দিলেন, এবং আমি এও লিখিনি যে কোনও মেয়েই দুর্বল কোমল ভীতু লজ্জাবতী নয়। অধিকাংশ পুরুষ এমনকি পুরুষতন্ত্রের ধারক কিছু নারীও ভাবে যে 'মেয়ে মাত্রই দুর্বল'..., তারা সকল নারীকেই এইসব বিশেষণে ভূষিত করতে চায়, এটি যে সত্য নয় তাই আমি বলতে চেয়েছি।

পুরুষের মধ্যেও দুর্বল ভীতু যেমন আছে, মেয়ের মধ্যেও আছে। সুতরাং ভীতু বা লজ্জাবতী হবার দোষ একতরফা মেয়েদের ঘাড়ে চাপানো উচিত নয়। যেহেতু আমি কোনও উদাহরণ দিইনি, এরকম উদাহরণ যে সপ্তা মেয়েটি দুলালের চেয়ে কঠোর সবল সাহসী, তাই তিনি লিখেছেন যে ওই একটি উদাহরণ, উদাহরণটিকে তিনি সাঁতার না জেনে পানিতে ডুবে মরা হিসেবে বিচার করেছেন, যদিও এতে সাঁতারের কোনও প্রশ্ন নেই, New born Baby'র সাঁতার জানবার প্রশ্ন ওঠে না, এটি সাঁতার ঘটিত মৃত্যু নয়, শরীর-বিজ্ঞান ঘটিত। আমি নিজে গায়নোকলজি প্র্যাকটিস করতে গিয়ে দেখেছি জন্মের সময় Normal, Obstructed এবং Ciserian মাধ্যমে হওয়া বাচ্চাগুলোর মধ্যে Servival rate মেয়ের বেলা বেশি। কেবল New born baby-র বেলায় নয়, লে ম্যান হিসেবেও জরিপ চালিয়েও শেখ মিজান দেখতে পারেন প্রাপ্ত বয়স্ক নারীও ফুসফুস, হৃদপিন্ড ও মস্তিষ্কের রোগে এত বেশি আক্রান্ত হয় না, যত হয় পুরুষ। হৃদপিন্ড, ফুসফুস এবং মস্তিষ্ক শরীরের Vital organ, নারীর যদি Vital organ সবল হয়, তবে আমার প্রশ্ন—সমাজের কিছু পুরুষ নারীকে যে দুর্বল প্রমাণ করতে চাইছে তা নিশ্চয়ই Non-vital কিছু দিয়ে? Non-vital মাংসপেশির শক্তিকে তিনি পুরুষের শক্তিমত্তার উদাহরণ হিসেবে বোঝাতে চাইছেন। Muscle সবল হবার পেছনে কারণ থাকে অনেক। জন্ম থেকে মেয়েদের অভ্যস্ত করা হয় অল্প আহারে, আহারে Carbohidrate এর ভাগই থাকে বেশি, Protien এর ভাগ নয়, তাদের হাত পা ছুঁড়ে খেলা করবার মাঠ দেওয়া হয় না যেমন দেওয়া হয় ছেলেকে। Nutrition পাওয়া, ব্যায়াম করা কোনও মেয়ের মাংসপেশি Nutrition না পাওয়া, ব্যায়াম না করা ছেলের চেয়ে শক্তিশালি হবে নিশ্চয়। এরও যদি উদাহরণ চান শেখ মিজান, তবে আমি বলব, আপনিই উদাহরণ তৈরি করে নিন, একটি ছেলেকে ঘরে বসিয়ে এঁটো কাঁটা খাইয়ে বড় করুন আর মেয়েকে নানারকম এক্সারসাইজ করান, আমিয় খাওয়ান, দেখবেন ভূরি ভূরি উদাহরণ তৈরি হতে সময় লাগবে না। আসলে পুরুষ নারীতে প্রাকৃতিক ভিন্নতা আছে ঠিকই কিন্তু তা কাউকে সবল বা দুর্বল করে না। যোগ্য বা অযোগ্য করে না। এই যোগ্যতা অযোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে সমাজপতিদের চাপানো আইন, রীতি নীতি, খাদ্য ও কাজ নির্ণয়ের মাধ্যমে।

আমি তথ্য ঠেসে রচনাটিকে প্রবন্ধ বানাতে চাইনি। আদিম যুগে নারী পুরুষ কাড়াকাড়ি করে জীবজন্তুর মাংস খেত এ কথা যেমন সত্য, এ কথাও সত্য যে নারী গর্ভবতী হলে শিকারে যেতে পারত না বলে তাকে সংগ্রহীতার কাজ নিতে হয়েছে, এবং শিকারের কাজ নিয়েছে পুরুষ, এবং সুযোগ তারা তখনই গ্রহণ করেছে যখন হাতে পড়েছে অস্ত্র। অস্ত্রের দাপটে সমাজ ব্যবস্থা সেই যে পুরুষের পক্ষে গেছে আজও পুরুষের পক্ষে। একসময়ের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ আজ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে রূপ নিয়েছে। বুনো জন্তুদের মধ্যেও পুরুষ-জন্তু শিকারে যায়, আর নারী-জন্তু তার গর্ভ রক্ষা করে। তার মানে এই নয় কিন্তু যে পুরুষ-বাঘের তুলনায় নারী-বাঘ কিছু কম শক্তিমান। নারী-বাঘ একাই তার টেরিটরিতে বাস করে, একাই সে নিজের খাবার যোগায়, কেবল গর্ভাবস্থায় সে শিকারের ভার পুরুষ-বাঘকে দেয়, এবং তাকে

বিশ্বাস নেই বলে বাচ্চা জন্ম দেবার পরই সে তাড়িয়ে দেয় বাচ্চার জন্মদাতা পিতা পুরুষ-বাঘকে, না তাড়ালে পুরুষ-বাঘ নির্দ্বিধায় খেয়ে ফেলবে বাচ্চাটিকে। যে বিশ্বাস জন্তুদের নেই, সেই বিশ্বাস মানুষ অর্জন করেছে বলে মানুষ আজ সমাজ তৈরি করেছে। কিন্তু এই সমাজে যথেষ্ট ফাঁকি আছে, কারণ এটি কোনও শ্রেণীহীন সমাজ নয়। পুরুষ এবং বিত্তবান তাদের অধিপত্যকে কায়দা করে সমাজের উঁচুতলায় বহাল করেছে। মানুষে মানুষে সমতা বা মমতা তত নেই তাই মানুষের মধ্য থেকে লিঙ্গ এবং বিত্ত ভেদ দূর হয়নি। শেখ মিজান সম্ভবত শক্তিমান বলতে মাংসপেশির জোরকে বোঝান। এখন আর পেশির শক্তি দিয়ে রাজ্য জয় সেই সঙ্গে মানুষ জয় করবার নিয়ম নেই। তবে কেন শক্তিমান বলতে পুরুষকে বোঝান হয়? তিনি লিখেছেন—'নারী হয়ত বা পুরুষের সমান বলশক্তি বলে প্রমাণিত হয়নি কিন্তু তারপরও সমাজের প্রয়োজনীয় খাদ্যের তিন চতুর্থাংশ যোগাড় করত নারী।' যে মানুষ সমাজের তিন চতুর্থাংশ খাদ্য যোগাড় করে সে যদি বলশালি না হয় বলশালি তবে কে? বল বিচার করবার ভার কার ওপর ছিল? এক চতুর্থাংশ খাদ্য যোগাড় করে যে মানুষ নিজেদের বলশালি বলে, সে কিসের জোরে? আমি অনুমান করছি সে অস্ত্রের জোরে। মানুষ হিসেবে সমান অধিকারের প্রশ্নে, আমি জানতে চাই, প্রমাণ কেন দিতে হবে নারীকে যে তার সামর্থ এবং যোগ্যতা আছে? সে যে মানুষ এই পরিচয়ই কি তার সমান অধিকার পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়?

শেখ মিজান যে কোনও প্রসঙ্গেই জানতে চান আমি তথ্য কোথায় পেলাম। 'নারী বিবেক বুদ্ধি দ্বারা অধিক চালিত, মমতা ও ভালবাসা ধারণ করবার ক্ষমতা সে বেশি রাখে' এই তথ্য আমি কোথায় পেয়েছি তিনি জানতে চেয়েছেন। এই তথ্য আমি মানুষের জীবন থেকে নিয়েছি, তিনি কি এর বিপরীত কোনও তথ্য পেয়েছেন? আমি কোথায় তথ্য পেয়েছি তা জানতে না চেয়ে তিনি যদি বিপরীত তথ্যটি দাঁড় করাতেন তবে মনে হতে পারত আমি ভুল বলেছি। তথ্যের জন্য আমি কেবল পুস্তকের ওপর নির্ভর করি না। কেবল পুঁথিগত তথ্য ভিত্তি করে আমার চিন্তা চেতনা অগ্রসর হয় না, আমি নিজের বিবেক বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝতে পারি নারী মমতা এবং ভালবাসা ধারণ করবার ক্ষমতা বেশি রাখে। Emperical observationএ দেখি নারীর Perseverance & patience বেশি। গর্ভাবস্থায় বুদ্ধি বাড়বার যে কথাটি নিয়ে শেখ মিজান প্রশ্ন তুলেছেন তাতে বলা যায় পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে তার বুদ্ধির বিকাশ হতেই পারে। প্রকৃতিবিজ্ঞানেও বিভিন্ন Copensatory mechanism আছে।

শেখ মিজান প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন 'কোন পুরুষ যদি কোন নারীর কাছে নিজের সন্তান চায় তখন সে সহযোগিতার দায়িত্ব প্রথমত পুরুষের'—আমার প্রশ্ন পুরুষ নারীর কাছে তার অর্থাৎ নিজের সন্তান চাইবে কেন? এ কি কৃষকের মত খেতের কাছে শস্য চাওয়া? নাকি মিলের শ্রমিক সুইচ টিপে কাপড় চাইছে যন্ত্রের কাছে? সন্তান একা পুরুষের হবে কেন? যে নারী ন' মাস সাতদিন জরায়ুতে সন্তান ধারণ করছে, প্রসব করছে —সেই সন্তানের ওপর কার বেশি অধিকার, নারীর না পুরুষের? নারীর ভাগে বেশি না দিয়ে যদি সমানের পক্ষপাতিই হই, তবে কি সমান অধিকার সামান্যও বিরাজ করছে আজকের সমাজে? পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কি

মায়ের পরিচয় এবং অধিকারকে কোথাও প্রতিষ্ঠা করেছে? স্বামী স্ত্রীতে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে সাত বছরের বেশি বয়সের সন্তানের ওপর মায়ের অধিকার থাকে না। পুরুষের জন্য নারী সন্তান উৎপাদন করবে, তাই পুরুষেরা তাকে সহযোগিতা করবে, শেখ মিজান লিখেছেন এতে নাকি নারীর অগৌরবের কিছু নেই। এর চেয়ে অগৌরব নারীর আর কি আছে যে নারী পুরুষকে সন্তান উপহার দেবে আর সেই বাবদ সে সহযোগিতা পাবে। তবে গায়ে পড়ে পুরুষের এই উপকার করবার প্রয়োজন কি নারীর? নারীকে সন্তান তৈরি করতে হবে তার নিজের জন্য। সে কোনও শস্যখেত নয় যে পুরুষেরা তার ভেতর কিছু রোপন করবে আর মৌসুমে গিয়ে ফল ভোগ করবে। নারী একজন মানুষ, নারী গর্ভধারণ করবে, সে যদি কাউকে তার সন্তানের পিতার পরিচয় দিতে চায় দেবে, নয়ত দেবে না। সে নিজেকে এবং প্রকৃতিকে একটি মানব সন্তান উপহার দেবে, অপর কোনও মানুষের কাছে যদি সে বাঁধা হয় তবে সে ক্রীতদাস নিশ্চয়ই।

যোগ্যতা বা দক্ষতা অনুযায়ি কোনও কাজ বা দায়িত্ব অর্পণে নারী পুরুষ ভেদাভেদের কোনও যৌক্তিকতা নেই। শেখ মিজান বলছেন পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা তাই করে আসছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নারী-পুরুষ ভেদাভেদের যে গড়মান এবং রেকর্ডের হিসেব দেখায় তা নারীকে অবমাননা করবার জন্য আর আমি বলছি নারী যে যোগ্য নয় বলা হচ্ছে এটা ঠিক নয়, নারী যোগ্য; নারী যে দক্ষ নয় লোকে বলছে, এটা ঠিক নয়, নারী দক্ষ; কখনও কখনও সে প্রভু-পুরুষের চেয়ে বেশি যোগ্যতা বা দক্ষতা দেখাচ্ছে। আমার এ আবেদনের অর্থ লিঙ্গবাদ প্রতিষ্ঠা করা নয়, অস্তিত্ব রক্ষা। যার অস্তিত্বই স্বীকার্য নয় সে কি করে লিঙ্গবাদ প্রতিষ্ঠা করে? পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর কোনও পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করে না, সেখানে অস্তিত্ব রক্ষা করবার জন্য নারীর যোগ্যতা বা দক্ষতার কথা যদি বলা হয় এটি যে লিঙ্গবাদের উদ্দেশ্যে এটি ভাবাও এক ধরণের পুরুষতান্ত্রিক মনোবৃত্তি। অথবা বাংলায় একটি প্রবাদ আছে 'চোরের মন পুলিশ পুলিশ'—এই প্রবাদটিও এ ক্ষেত্রে খাটে।

২.

পরিমাপ-যন্ত্রটি কার হাতে? কে নির্ণয় করবে কার পরিমিতি বা অপরিমিতি? একা শেখ মিজান এই মাপযন্ত্রটি নিয়ে বসে থাকলে ব্যাপারটি পুরুষ-নিয়ন্তার স্বরূপ প্রকাশ করে না কি? পুরুষেরা হামেশাই মাপজোক করছে নারীর কণ্ঠস্বরের পরিমিতি, তার হাঁটাচলার কথা বলবার হাসবার দৌড়বার পরিমিতি; ঠিক সেই মাপযন্ত্র থেকেই সম্ভবত তিনি আমার পরিমিতিবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আমার রচনার ভেন্টিলেটর, খাঁচা, হাঁপরের খুঁটির যে উপমা দেওয়া হয়েছে তার উল্লেখ করেছেন। 'প্রবন্ধে' (এই রচনাটি যে প্রবন্ধ নয় তা তিনি প্রথমেই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু এখানে এসে তিনি রচনাটিকে আবার প্রবন্ধই বলছেন।) কি Allegory চলে না শেখ মিজান? কে বলেছে Allegory কেবল কবিতায় চলতে পারে, প্রবন্ধে নয়? প্রবন্ধের সংজ্ঞা তৈরি করবার দায়িত্ব কার? সংজ্ঞা বদলায় না? নাকি পুরুষ-আধিপত্যের মত গেড়ে বসা এইসব সংজ্ঞারও কোনওদিন বদল চান না তিনি?

বেগম রোকেয়াকে সময়ের প্রতীক ধরে তিনি যে প্রশ্ন করেছেন তা আমাকে বিস্মিত করেছে। বাঙালিদেশের অশিক্ষিত, জ্ঞানবুদ্ধি বিবর্জিত, অসচেতন কিছু মানুষ এধরনের কথা বলে যে এদেশ চমৎকার নারী স্বাধীনতা চলছে বা আগের চেয়ে অনেক বেশি উন্নতি হয়েছে নারীর অবস্থার। আমার প্রশ্ন, বেগম রোকেয়ার সময় থেকে বাঙালিদেশে নারীর অবস্থার আদৌ কি কোনও উন্নতি হয়েছে বাহ্যিক চাকচিক্য ছাড়া? একশ বারো বছর পরও কি দেশে বাল্যবিবাহ, বধূহত্যা, তালাক ও বহুবিবাহের অত্যাচার নেই? নারীর অশিক্ষা অন্ধত্ব কিছু কমেছে? পুরনো বোধগুলো, যেমন নারীকে পর্দার ভেতর থাকতে হবে (যে পর্দা এখন কেবল গ্রামে নয়, নাগরিক রীতিতে মেয়েদের গায়ে উঠেছে, ইসলামিক দেশ থেকে আসা নানাধরণের বোরখায় ছেয়ে গেছে বাজার; স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির মেয়েরা এমনকি মেডিকেলে পড়া মেয়েরাও আপাদমস্তক ঢেকে কেবল চোখদুটো কালো নেকাবের ফাঁক দিয়ে বের করে চলাফেরা করে।), দিন দিন এই পর্দা-প্রবণতা বাড়ছে, সেদিন সিলেটের ছাতকছড়া গ্রামে মাওলানাদের ফতোয়ায় ব্যভিচারের দায়ে নূরজাহান নামের এক মেয়েকে গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তে দাঁড় করিয়ে পাথর ছুঁড়ে মারা হল, সাতক্ষিরার কালিকাপুর গ্রামে প্রেম করবার অপরাধে ষোল বছরের ফিরোজাকে এক মাওলানা একশ ঝাঁটা পেটা করবার ফতোয়া দিল, ঝাঁটাপেটা হল, ফিরোজা মারা গেল। এরকম কত মরছে গ্রামে শহরে, কত স্বামী কত স্ত্রীকে গলা টিপে মারছে, দায়ে কুপিয়ে মারছে, ফাঁসিতে ঝোলাচ্ছে, মাওলানাদের ফতোয়ায় বাংলার গ্রাম আজ কলুষিত। আমরা আর কটি মৃত্যুর খবর পাই! কটি ফাঁসি, কটি এসিড ছোঁড়া, কটি যৌতুকের নির্যাতনের খবর আর আমাদের কাছে এসে পৌঁছোয়! কোনও পত্রিকা যদি দয়া করে উদ্যোগ নেয় এসব ছাপাবার, তবেই লোকেরা তা নিয়ে কিছুদিন হল্লা করবার সুযোগ পায়। এখনও পারিবারিক আইন থেকে শরিয়ার গন্ধ দূর হয়নি, এখনও কাবিননামায় স্ত্রীর তালাক দেবার অধিকার যদি ছকের বাইরে বাড়তি লিখে দেওয়া হয় তবেই তালাক দেবার অধিকার সে পায়, নয়ত পায় না। আজও অনেক শিক্ষিত (!) মেয়ের কাবিননামায় স্বামীকে তালাক দেবার অধিকারের কথা লেখা নেই। বেগম রোকেয়ার সময়ে পুরুষের বহুবিবাহের জন্য স্ত্রী অনুমতির দরকার হত না, ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইনে বহুবিবাহের জন্য স্ত্রীর অনুমতির নিয়ম করা হয়েছে। সেই সময় থেকে এই সময় পর্যন্ত আসলে এরকম উন্নতিই হয়েছে যে বহুবিবাহে কোনও বাধা নেই, অনুমতিটা কেবল নিতে হবে। এই সমাজে মেয়েরা স্বামীর ঘরে More or less দাসীর ভূমিকা পালক করে। শেখ মিজান দুএকটি ব্যতিক্রমের কথা বলতে পারেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার Exception কখনও Example হয় না। শেখ মিজান তাঁর রচনার প্রথম দিকে আমার 'পুরুষেরা দড়িবাঁধা নারীর স্বাদ পেতে চায়, আবার দড়ি ছেঁড়া নারীর স্বাদও।' —এই বাক্যটির সমালোচনা করেছেন এভাবে যে '...সমস্ত অন্ধ্রলোক, সমগ্র পুরুষ জাতিই এখানে অভিযুক্ত।'.. শেখ মিজান বলতে চান সকল পুরুষ এই কাজ করছে না। অর্থাৎ কিছু পুরুষ আছে যারা নারী পুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী, যারা বিবেকবান, যুক্তিবাদি, সৎ ও সহিষ্ণু। তারা নিশ্চয়ই আজকের সমাজে ব্যতিক্রম। তাহলেও তো ওই কথা বলতে হয়

যে Exception কখনও Example হয় না।

শেখ মিজান লিখেছেন রমনা পার্ক সন্ধ্যার পর একজন পুরুষের জন্যও নিরাপদ নয়। এ কথা বলে তিনি প্রমাণ করতে চাইছেন যে যেহেতু পুরুষের জন্যও তা নিরাপদ নয়, নারীর জন্য নিরাপদ না হবার কোনও কারণ নেই। কিন্তু যে অর্থে পুরুষের জন্য তা নিরাপদ নয় সে অর্থে কিন্তু নারীর বেলায় নয়। পুরুষের জন্যও নিরাপদ নয় কারণ ছিনতাই হতে পারে, ছিনতাই তো নারীরও হতে পারে। কিন্তু অপহরণ এবং ধর্ষণ, Sexual assault কি পুরুষের বেলায় ঘটে? এই দেশে? দুঃখ লাগল তিনি সেই অবস্থাকেই কেবল সঙ্কটজনক অবস্থা বলছেন 'যে অবস্থায় পল্টনের ফুটপাত দিয়ে সকাল দশটাতেও একটি মেয়ে একা হাঁটতে গেলে ধর্ষিতা-অপহৃতা হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে।' আমি এ কথা বলিনি যে সকাল দশটাতেও একটি মেয়েকে একা হাঁটতে গেলে ধর্ষিতা হতে হয়, তবে দিনের বেলায় কোনও রকম অপহরণ এবং ধর্ষণ যে ঘটে না তাও ঠিক নয়, ঘটে; সেদিন স্বাস্থ্য বিভাগে চাকরি করে এক মেয়ে গৌরি রাণী দাস, সে এসেছিল মহাখালির স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে, অফিস থেকে বাড়ি ফিরবার পথে স্বাস্থ্য পরিচালকের গাড়ির ড্রাইভার তার সাঙ্গপাঙ নিয়ে গৌরিকে অপহরণ করে, সকলে মিলে তাকে ধর্ষণ করে। এক মেয়ে পতিতালয় থেকে পালিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছিল, তাকেও সেদিন মিরপুরে গণধর্ষণ করা হয়, ভর দুপুরে। দিনের বেলায়ও মেয়েদের জবাই করে মনীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, পিঠে ছুরি বসানো হয়, গলা টিপে মেরে ফেলা হয়। ঘটনাগুলো রাতের বেলায় ঘটলেই শেখ মিজান ভাবছেন অবস্থা সঙ্কটজনক নয়, কেবল দিনের বেলা ঘটলেই সঙ্কটজনক। ঘটনা যদি ঘটেই তার আর রাত দিন কি? রাত একটায় তিনি স্বীকার করছেন কোনও মেয়ে একা বাইরে বেরোলে তাকে ধর্ষিতা হতেই হবে, এই কি তবে সঙ্কটজনক অবস্থার উদাহরণ নয়? তিনি কেন এটিকে সঙ্কটজনক অবস্থা বলবেন না, আমার প্রশ্ন। কেন একটি নারীকে সে রাতে বেরোলে অপহরণ বা ধর্ষণের শিকার হতে হবে?

অভদ্রতার বাইরে গেলেই মেয়েদের 'বেশ্যা' বলে গাল দেওয়া হয়, এটি শেখ মিজান স্বীকার করেন না। শোভন সীমানার বাইরে গিয়ে বাঁধা সময়ের মধ্যে ঘরে ফিরলে একটি মেয়েকে কি কেবলই 'অভদ্র' বলা হয়? ধরা যাক একটি মেয়ের সীমানা তার স্কুল বা কলেজ, অথবা যে মেয়ে স্কুল কলেজে পড়ে না তার কর্মক্ষেত্র আর কর্মহীনের দুএকজন আত্মীয়ের বাড়ি এবং দুএকটি মার্কেট—সাধারণত এরকমই বেঁধে দেন মেয়ের অভিভাবকেরা। যদি সেই মেয়ে তার বেঁধে দেওয়া সীমানা পেরিয়ে যায় অর্থাৎ কলেজ, আত্মীয়ের বাড়ি বা কর্মক্ষেত্রে না গিয়ে অন্য কোথাও যায় এবং ফিরে আসে মাপা সময়ের পর, ধরা যাক দুদিন বা তিনদিন পর সে বাড়ি ফিরল, তবে কি তাকে কেবলই অভদ্র বলা হয়? আমি যতদূর জানি তাদের বলা হয় 'নষ্ট মেয়ে', 'খারাপ মেয়ে', 'বেশ্যা।' কিন্তু একই রকম কোনও ছেলে যদি দুদিন পর কোনও অজ্ঞাতবাস শেষে বাড়ি ফেরে, তাকে ভাবুক, কবি, উড়নচণ্ডি, বোহেমিয়ান বলা হতে পারে, বড়জোর বলা হতে পারে 'অভদ্র' কিন্তু নষ্ট ছেলে, খারাপ ছেলে বা পতিত ছেলে বলা হয় না। অভদ্র আর বেশ্যা কখনও সমার্থক শব্দ নয়।

শেখ মিজান লিখেছেন 'রকে রাস্তা বা রেস্তোরাঁয় এক হাঁটলে বা বসলেই মানুষ তাকে বেশ্যা বলে সন্দেহ করে না। বিশেষ ভাবে দিন রাত্রির কোন ভাগে, কোথায়, কি ভঙ্গিতে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে আছে সেটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।' আমি অবাক হই কোন ভঙ্গি বেশ্যার এবং কোন ভঙ্গি বেশ্যার নয় তা কি করে বোঝা যায়? সময়, ভঙ্গি, স্থান কি বেশ্যার জন্য নির্দিষ্ট করা? বেশ্যা ছাড়া আর কারও কি অধিকার নেই সেই ভঙ্গি, সেই স্থান, সেই সময় গ্রহণ করা? ধরা যাক দিনরাত্রির ভাগে সেটি রাত্রি, আটটা নটা বা দশটা, একা একটি মেয়ে রমনা পার্কের কিনারে ত্রিভঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। লোকে নিশ্চয়ই ভাববে এটি পতিতার ভঙ্গি। একই রকম একটি ছেলে ওই সময়ে, ওই স্থানে, যদি একই ভঙ্গি করে দাঁড়ায় তাকে কি নামে ডাকা হবে? 'পতিত'? নিশ্চয় নয়।

দুর্বিনীত এবং উদ্ধত শব্দ দুটো ব্যবহার না করে সাবলীল এবং সাহসী শব্দ ব্যবহার করবার পক্ষে লিখেছেন শেখ মিজান। সম্ভবত তিনিও আর সব সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের বেলায় দুর্বিনীত শব্দটি ছেলের জন্য খাটলেও মেয়ের জন্য খাটে না বলে ভাবছেন। যেমন ধারণা করা হয় লাজুক বিশেষণটি মেয়ের জন্য খাটলেও ছেলের জন্য খাটে না। দুর্বিনীত শব্দের অর্থ অবিনয়ী, উদ্ধত। আসলে একটি ছেলে বিনয় না করলে লোকের কিছু যায় আসে না বরং সাহসী হিসেবে তাকে একরকম বাহবা দেওয়াই হয়। কিন্তু একটি মেয়ের বিনয় না করা সমাজের কেউ ভাল চোখে দেখে না। উদ্ধত শব্দের অর্থ অবিনীত, ধৃষ্ট, স্পর্ধিত, দুর্দান্ত, গর্বিত একরকম। সাবলীল শব্দের অর্থ অনায়াস, স্বচ্ছন্দ, লীলায়িত। 'উদ্ধত' শব্দের বদলে 'সাবলীল' শব্দ লিখবার প্রস্তাব করবার মধ্যে লেখকের হীনমনা পৌরুষিক মনোভাব ফুটে বেরোয়। যা আমাদের পিছিয়ে থাকা অনগ্রসর, ধর্মান্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে প্রচলিত। একটি মেয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই দুর্বিনীত, দুর্দান্ত, স্পর্ধিত হতে পারে, একটি ছেলেও যেমন পারে; কিন্তু এ কারণে শেখ মিজান যে বলেছেন 'দুর্বিনীত বা উদ্ধত ভঙ্গির জন্য মানুষ কোনও ছেলে বা মেয়েকে মন্দ বলবে, এবং বিশেষ প্রকার দুর্বিনীত এবং উদ্ধত ভঙ্গির জন্য একটি ছেলেকে ইতর বা একটি মেয়েকে বেশ্যা বলে সন্দেহ করবে এতে তো অন্যায় বা অযৌক্তিক কিছু দেখি না।' —এ কথা কি কোনও রকম যুক্তিসঙ্গত? আমি নিশ্চয়ই এই আচরণকে অন্যায় বলব যদি দুর্বিনীত বা উদ্ধত ভঙ্গির জন্য কোনও মেয়েকে বেশ্যা বলা হয়। যে কারণে ছেলেকে 'ইতর' বলা হচ্ছে, একই কারণে মেয়েকে ইতর না বলে কেন 'বেশ্যা' বলা হয়? আমার প্রশ্ন এখানেই। ইতর শব্দের অর্থ নীচ, অধম আর বেশ্যা শব্দের অর্থ যে দেহ ব্যবসা করছে, গণিকা, বারাঙ্গনা। দুটোর অর্থ কখনও এক নয়। দুর্বিনীত আচরণের জন্য যদি ইতর বলবার প্রয়োজন হয়, তবে ছেলে মেয়ে উভয়কেই ইতর বলতে হবে। শেখ মিজানের আরেকটি কথার সঙ্গে আমি দ্বিমত পোষণ করছি তা হল কোনও ছেলেকে তার দুর্বিনীত বা উদ্ধত আচরণের জন্য 'ইতর' বলে গাল দেওয়া হয় না। ওটিকে পুরুষের স্বভাব বলেই জ্ঞান করা হয়। এই আচরণের কারণে কখনও কখনও সমাজে সে প্রতিভাধর হিসেবেও পরিচিতি পায়। বেশ্যা বলে যারা মেয়েদের গাল দেয়, শেখ মিজান লিখেছেন তারা 'সমাজে মূর্খ ইতর দুর্বৃত্ত

হিসেবেই চিহ্নিত'। মিথ্যে কথা। সমাজে শিক্ষিত ভদ্র সজ্জন ভদ্রলোক হিসেবে পরিচিত মানুষও মেয়েদের ফাঁক পেলেই বেশ্যা বলে। মেয়েরা সমাজ এবং ধর্ম নির্দেশিত সীমানার বাইরে গেলে তাদের এই অপবাদ শুনতে হয়। সমাজপতি পুরুষেরা যেমন সীমানা বেঁধে দেয়, শেখ মিজানও তাদের মতই পরিমিতির জ্ঞান দিয়েছেন লেখায়, সম্ভবত আমি মেয়ে বলেই পরিমিতির প্রশ্ন বারবার তিনি তার অবচেতনেই তুলেছেন। কারণ মেয়েরা 'মাত্রা' ছাড়ালে যত বড় প্রগতিবাদি পুরুষই হোক, তারাও মন্দ বলে।

৩.

'নারী কেন সঙ্গে পুরুষ ছাড়া হেঁটে বেড়াবে' —সমাজের অধিকাংশ মানুষের এই প্রশ্নের যে যুক্তি শেখ মিজান দাঁড় করিয়েছেন তা আবারও তাঁর পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবকে প্রকাশ করে। যেমন তিনি লিখেছেন 'একাকি একজন মানুষ দুর্বল থাকে, সেই দুর্বলতার সুযোগ দুর্বৃত্ত পুরুষেরা নিতে চায়। একা হাঁটার তুলনায় একজন সবল পুরুষকে নিয়ে হাঁটা অবশ্যই নিরাপদ, একজন নারী থাকলেও বিপদাপন্ন হবার সম্ভাবনা কমে।' আমার বিশ্বাস এই সমাজের চেহারা শেখ মিজানের ভাল করে দেখবার সুযোগ হয়নি। এই সমাজে একজন পুরুষ নিয়ে চলা নিরাপদ হতে পারে কিন্তু দুজন মেয়ের চলা নিরাপদ —একথা ঠিক নয়। একটি বাঘের সামনে একটি হরিণ পড়লে যদি বিপজ্জনক, দুটো হরিণ পড়লে কি বিপদ কিছু কমে? নাকি বাঘের লালা আরও গড়ায় বেশি? (এখানে বাঘ হরিণের উপমা এসেছে সামাজিক দৃষ্টিতে, শক্তি বা প্রকৃতি বিচার করে নয়।) আর আরেকটি প্রশ্ন তা হল সবল পুরুষকে নিয়ে হাঁটতে হবে কেন মেয়েদের? তার নিরাপত্তার জন্য কেন সে একাই যথেষ্ট নয়? এখানে কি রাষ্ট্রের উচিত নয় প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান করা? কেন পুরুষেরা লোভনীয় খাদ্য হিসেবে মেয়েদের বিচার করবে এবং এই মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য সমাজ বা রাষ্ট্র কি কোনও দায়িত্ব পালন করে? শেখ মিজান লিখেছেন 'যেহেতু পুরুষ সাধারণত অধিকতর সবল সেহেতু একজন পুরুষ সঙ্গী অধিকতর নিরাপত্তা দিতে পারে।' তাঁর এই কথাটি নিতান্তই যুক্তিহীন। কি কারণে পুরুষেরা সবল? সামাজিক সুযোগ সুবিধার বল ছাড়া পুরুষের কি বল আর আছে নারীর চেয়ে অধিক? তাছাড়া কোনও ব্যক্তি-পুরুষ কেন নারীকে নিরাপত্তা দেবে? নিরাপত্তার কথা যদি ওঠেই তবে রাষ্ট্র নিরাপত্তা দেবে পুরুষ এবং নারীকে সমান ভাবে। তিনি লিখেছেন সমাজ যে পুরুষের ওপর নারীকে নির্ভর করাতে চায় সেটি প্রমাণ করতে যদি চাই, আমার পদ্ধতিটি তবে ভুল পদ্ধতি। কোন পদ্ধতিটি ঠিক কোনটি ভুল তা লেখক একবাক্যে রায় দিতে পারেন না। কারণ কোথাও কোনও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা থাকে না, কখনও এ কথা স্থির করা নয় যে এই পদ্ধতি মত এগোলে 'প্রমাণ' ঠিক হয় তাছাড়া হয় না। পুরুষ সঙ্গে না থাকলে যে ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় সেটির বর্ণনা দেওয়া এ কথা প্রমাণ করে না যে পুরুষের ওপর নারীকে নির্ভর করতে বাধ্য করতে চাওয়ার এটি কোনও প্রমাণ নয়।

'ভয় নারীর ভূষণ' —এটি হয়ত প্রবাদ হিসেবে তেমন আদর পায়নি তাই বলে যে এই ধারণা সমাজে প্রচলিত নয় তা কিন্তু ঠিক নয়। 'এত রাতে বাইরে বেরোবে না, ভয় লাগে' —এসব

না বলে কোনও মেয়ে যদি বলে 'রাত হয়েছে তো কি হয়েছে, যে যা বলুক বাইরে বেরোব', 'মিছিল যাচ্ছে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি', 'স্বামীর অনুমতির আবার কী দরকার; যেত হবে যাব' —তবে তাকে সমাজের কেউ ভাল মেয়ে বলবে, তার 'লক্ষণ' আছে বলে কেউ স্বীকার করবে —এ আমার বিশ্বাস হয় না। শেখ মিজান লিখেছেন 'যতদিন সমাজে পুরুষ-দুর্বৃত্ত থাকবে ততদিন একজন নারীকে চলাফেরায় একজন পুরুষের তুলনায় বেশি ভয় পেতে হবে, বেশি সাবধানি হতে হবে।' কেন? পুরুষ-দুর্বৃত্তদের জন্য আইনের ব্যবস্থা কঠোর হলে নারীকে কেন ভয় পেতে চলতে হবে? তবে আর রাষ্ট্র কেন, সংবিধান কেন? মানবধিকার কেন? একজন নাগরিকের কেন আরেক নাগরিককে ভয় পেতে হবে? এটি প্রকারান্তরে নারীর নাগরিক-অধিকার লঙ্ঘন করা নয়? 'একজন নারীর ভয় করার মত কিছু বাড়তি বিষয় থাকে।'—শেখ মিজানের এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করছি আমি। একজন নারীর বাড়তি বিষয় বলতে যদি তিনি নারী-অঙ্গের কিছু নরম বা দুর্বল জিনিস বুঝিয়ে থাকেন, তবে পুরুষের একটি দুর্বল প্রত্যঙ্গের কথা তোলা যায়, Scrotum। এতে আঘাত লাগলে পুরুষেরা মুহূর্তে মূর্ছা যায়, যে আঘাত নারীর কোনও Sensitive প্রত্যঙ্গে পড়লে সে মূর্ছা যায় না। পুরুষের কিন্তু এ নিয়ে বাড়তি ভয় থাকা উচিত। কিন্তু তারা সেই ভয় করছে না, কারণ চল নেই। চল নারীর অঙ্গে আঘাত করবার। সেখানে পুরুষ জবরজীর্ণ পশু অথর্ব হলেও তার গায়ে কেউ টোকা দেবে না। বরং তার হুংকারে নারীরা অধোবদন দাসি হয়েই থাকবে। এ হচ্ছে সিস্টেমের প্রতি নত থাকা। সিস্টেমের প্রতিবাদ করলে প্রচড চাপ এসে পড়ে নারীর ওপর, অনেক নারীই এই রিস্ক নিতে চাইনা, না নিলে সমাজের নানা পুরস্কার তাকে দেওয়া হয়। পুরস্কারের লোভ সবাই সংবরণ করতে পারে না।

সবল চিরকাল দুর্বলের ওপর চড়াও হয়। তাই বলে পুরুষকে সবল ঘোষণা করবার আমি কোনও কারণ দেখি না। মানুষ—সে নারী হোক পুরুষ হোক ব্যক্তি হিসেবে সে সবল কিংবা দুর্বল হতে পারে, কিন্তু লিঙ্গ ভিত্তিতে নয়। সমাজের কিছু পুরুষ 'পুরুষমাত্রই সবল' এরকম একটি ভুল ধারণা গায়ের জোরে দাঁড় করিয়েছে। এইসব ধারণা নির্মূল করে সমাজে সমতার বোধ ছড়িয়ে দিতে হবে।

শেখ মিজান অস্বীকার করেননি নারীর সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক ভোগ, বংশরক্ষা এবং কর্তৃত্ব করবার নয়, তিনি এসব স্বীকার করেই আরও যোগ করেছেন স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, প্রেম এসবও থাকে নারী পুরুষের সম্পর্কে। হ্যাঁ, থাকে, আমিও তা অস্বীকার করছি না, তবে এসবে কিছু করুণা মিশে থাকে। যেমন পিতা বলে 'আহা মেয়ে হয়ে জন্মেছে, দুর্ভাগা মেয়ে, একে কিছু আদর টাদর করে দিই।' পুত্র বলে 'আহা মা তো সারাজীবন কষ্ট করে আমাকে বা আমাদের লালন পালন করলেন, মা আর যাবেন কোথায়, যতদিন বেঁচে আছেন তাঁকে ভাত কাপড়টা না হয় দিই।' ভাই বলে 'আহা বোনের কোথায় বিয়ে হবে কে জানে, কোন নরকে পড়ে থাকবে তার চেয়ে যে কদিন পারি বোনটাকে এটা ওটা কিছু দিই।' স্বামী বলে 'আহা আমার অর্ডার মত কাজ করছে, যখন একে যেভাবে চাচ্ছি পাচ্ছি, আমার সন্তান পেটে রাখছে,

জন্ম দিচ্ছে, লালন পালন করছে, বেচারা আমারই ডিনিস, একে একটু দেখভাল করি।' এরপরও কিছু পিতা, পুত্র ভাই এবং স্বামীর করুণা মিশ্রিত স্নেহ শ্রদ্ধা ভালবাসা প্রেমের পাশাপাশি নারীর ওপর কর্তৃত্ব করা, শক্তি খাটানো, গলার জোর গায়ের জোর দেখানো কমে না।

শেখ মিজানের মা বোন স্ত্রী এবং মেয়ে সাজগোজ বলে তিনি বলতে চান তারা যত্নের আশায় সাজে না। তবে তারা সাজে কেন? কি কারণে একটি মেয়ের ওপর রং চড়াতে হয়? সে সাজবে, দেখতে তাকে ভাল লাগবে, এই কারণেই তো? তাকে ভালই বা কেন লাগতে হবে —আমার প্রশ্ন এটিই। সামাজিক যত্নের আশায় তাঁর মা বোন স্ত্রী সাজছে। তাঁর বাবা, ভগ্নিপতি এবং তিনি নিজে এক সামাজিক যত্নের। এই যত্নেরা মেয়েদের ভাত কাপড় দেয় এবং সামাজিক পরিচয় দান করে। বিনিময়ে মেয়েরা নিশ্চয় যত্নেরের নানারকম আকাঙ্ক্ষা নিবারণ করে। কন্যাটি যে কপালে টিপ পরছে, সে আসলে পরছে না, সে পরতে শিখছে, তাকে শেখানো হচ্ছে। শেখানো হচ্ছে এভাবে টিপ পরতে হয়, এভাবে কানে দুল, হাতে চুড়ি, গলায় মালা, গলে রুজ পরতে হয়। এসব পরলে তাকে সুন্দর লাগবে, সুন্দর লাগলে লোকে তাকে পছন্দ করবে, পছন্দ করলে তার বিয়ে হবে। বিয়ে হলে নারীজন্ম সার্থক হবে। ব্যস এটুকুই। দেড় বছরের মেয়ের গায়েও চড়ানো হচ্ছে সামাজিক শৃঙ্খল, মস্তিষ্কে ঢাকা হচ্ছে নিজেকে পণ্য বানাবার কায়দা।

৪.

কোন মাঠে, কোন ফুটপাতে, রাত কটায় হাঁটতে হবে মেয়েদের তার একটি ভদ্রোজনোচিত হিসেব বোধহয় লেখকের কাছে আছে তাই তিনি বারবারই সময় এবং স্থানের কথা উত্থাপন করছেন। তিনি লিখিছেন — 'পৃথিবীর কোনও দেশেই সকল মাঠ, ঘাট, ফুটপাত, রাত-দুপুরে একাকি একজন নারী তো দূরের কথা দিন-দুপুরে দুই বা ততোধিক পুরুষের জন্যও নিরাপদ নয়।' দিনে দুপুরে দুই বা ততোধিক পুরুষের জন্য যা নিরাপদ নয় তার পেছনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কারণ থাকে কিন্তু নারীর জন্য এসব কারণের বাইরেও আরও একটি কারণ থাকে —শারীরিক। যেটিতে আমার আপত্তি। শেখ মিজান ভুল করছেন —প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির যেহেতু দেহরক্ষীর প্রয়োজন, তাঁদের নিরাপত্তাহীনতার সঙ্গে সাধারণ নারীদের নিরাপত্তাহীনতা মিলিয়ে। 'পুরুষ রাষ্ট্রপতির' যে কারণে নিরাপত্তা নেই সে কারণে কি একজন সাধারণ নারীর নিরাপত্তা নেই?' শেখ মিজান নিজেই আবার স্বীকার করেছেন একজন নারী অপরাধের শিকার হলে সামগ্রিক আইন শৃঙ্খলার কারণে তো বটেই পুরুষ-আধিপত্যবাদি মানসিকতার কারণেও তা ঘটতে পারে। শেখ মিজান যে কোনও প্রসঙ্গ নিয়ে তর্ক করেন কিন্তু শেষে গিয়ে প্রায়ই পুরুষ আধিপত্যবাদের জন্য যে সব ঘটছে তা স্বীকার করেন। তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন আমার ক্ষোভ পুরুষ আধিপত্যবাদ নিয়ে।

একটি মেয়েকে কোনও নির্জনে বসে থাকতে দেখলে বখাটে ছেলেরা উৎপাত করে বলে তিনি স্বীকার করেছেন। তিনি জানতে চেয়েছেন 'বখাটে ছেলেদের সমস্যা কি পুরুষ

অভিভাবকহীনের সমস্যা নাকি সমাজের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সমস্যা?' যদি একে পুরুষ অভিভাবকহীন না থাকে, তবে মেয়ে বখাটেও ছাড়বে। যারা পার্কে বা মাঠে একা ছেলে বসে থাকলে হাতে নিয়ে চৌধুরানী দুটি নিক্ষেপ করবে, ঢিল ছুঁড়বে, পা ধাক্কা দেবে, ঢিল ছুঁড়বে। তা কিছু ঘটে না। ভ্রাম্যমাণ পতিতাদের যদি বখাটে-মেয়ে ভাবা হয়, তবে ছেলে-বখাটেদেরও একই জাতীয়ভাবে কেন 'ভ্রাম্যমাণ পতিত' বলা যায়। সমাজ কি এই জেনানা 'পতিত' বলবে? যারা 'পতিতা'র অপর সঙ্গী যেকোনই কিছু করে রমনার ফুটপাতে, তাদের কেন 'পতিত' বলা হয় না? পত্রিকায় পতিতাদের ছবি যায়, তাদের করুণ জীবনী যার কিছু পত্রিকায় ছাপা কোনও পতিতের জীবনকাহিনী এমন কি কোনও ছবিও কেউ কোথাও ছেপে দেয় না। ভ্রাম্যমাণ পতিতাদের পুলিশ ধরে ধরে থানায় পোরে, কিন্তু এইসব ভ্রাম্যমাণ পতিতদের কেউ কখনও লকআপে ভরে না।

শেখ মিজান বরাবর ভুল করেন, আমি কোনও নারীতান্ত্রিক সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা চাই না। আমি চাই মানবতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। ধর্ষণের জন্য পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া মানে কিন্তু এই না যে প্রতিটি মেয়ের পেছনে দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্রের কঠোর আইন তো থাকবেই, তার ওপর প্রতিটি মেয়েকে শিক্ষিত স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে হবে, ছেলেদেরও শিক্ষিত স্বাবলম্বী হওয়া প্রয়োজন। নারীকে অসম্মান করে এমন আইন সমাজে রাষ্ট্রে যা বহাল রয়েছে বিচার করতে তাকে নির্মূল করতে হবে। সর্বাগ্রে বিচার করবে নারী-পুরুষের সমান অধিকার আছে এমন আধুনিক আইন। শেখ মিজান যে দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি তেমন অসন্তোষ প্রকাশ করছেন না বা দাবীই করে একেবারে মেনেই নিয়েছেন সেই দেশে কিন্তু জাতিসংঘের 'নারীর ওপর সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ'টিও শর্ত সহিত অনুমোদন পায় নি। যে ধারাগুলো অনুমোদন পায়নি সেগুলোতে আছে উত্তরাধিকার—বিবাহ—বিবাহ বিচ্ছেদ—সন্তানের অভিভাবকত্ব ইত্যাদিতে নারী পুরুষের সমান অধিকার। সরকার বলছে এই ধারাগুলো মানা যাবে না কারণ ইসলামি শরিয়া আইনের সঙ্গে এই ধারাগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ না। শরিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন যদি বিরাজ করে দেশে তবে আর যে স্বাধীনতার কথাই তারা বলুক, নিশ্চয়ই নারী-স্বাধীনতার কথা না।

শেখ মিজান একটি অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে 'সমাজে যতদিন অপরাধ ঘটার সুযোগ থাকবে ততদিন ঢালাও দেওয়ার নারীর নিরাপত্তা পুরুষের সমান করা সম্ভব না।' এ একটি কাণ্ডজ্ঞানহীন মন্তব্য। পৃথিবীতে সব কিছুই সম্ভব, আগে তো মা ছেলে পিতা কন্যা ভাই বোনে যৌন সম্পর্ক হত, সভ্যতা কি মানুষকে এই অবস্থা থেকে নতুন অবস্থায় আনেনি? অন্যান্য অপরাধ ঘটার হলে নারীর ওপর পুরুষের নির্যাতন ঘটবে তিনি বলেছেন—আমি কিন্তু আর সকল সাধারণ অপরাধের সঙ্গে নারী নির্যাতনকে মোটেও মেলাতে পারি না। আদিম অনেক খুন খারাবা হত, এখনও হয়, তাই বলে হত্যা চুরি ছিনতাই ইত্যাদি অপরাধ বন্ধ হলে নারী নির্যাতন বন্ধ হবে, এই সমীকরণ আমি মানব কেন? এও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নতুন নারীকে ভোলানো ছড়া —হত্যা চুরি খুন রাহাজানি ইত্যাদি অপরাধের সঙ্গে যৌনিক অপরাধ জড়ানো।

শেখ মিজান আমেরিকার এক স্ত্রীর নিরাপত্তাহীনতার কথা লিখেছেন। এতে কিন্তু আমার কোনও বাক্যের যুক্তি খণ্ডানো যায় না। কারণ আমি কোথাও বলিনি আমেরিকার মেয়েরা সর্বপ্রকারে স্বাধীন। তাদের ওপর নির্যাতন হওয়ার অর্থ কিন্তু এই না যে নারী স্বাধীনতা ব্যাপারটি অর্থহীন, যুক্তিহীন। আমেরিকা যদি তার নাগরিকের সবটুকু নিরাপত্তা দিতে না পারে সে দোষ আমেরিকার রাষ্ট্রব্যবস্থার, দোষ নারী স্বাধীনতার না।

সকাল দুপুর রাত মাঠে ময়দানে ফুটপাতে পার্কে একা ঘুরে বেড়ানোকে শেখ মিজান খুব তুচ্ছ করে দেখছেন। ব্যাপারটি কিন্তু তুচ্ছ না। অপসংস্কৃতিতে মনে হতে পারে নারীর জন্য কতরকম শালীনতা আছে যেসব না মেনে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছাটা নিতান্তই মধ্যবিত্ত শখ। হ্যাঁ, এটি মধ্যবিত্তের শখ হোক আর যাই হোক, এটি আমার জন্মগত অধিকার। এই তুচ্ছ অধিকারটিই আমাকে পেতে হবে। সমাজ যদি শক্ত না হয় এই অধিকার যে কোনও নারীর দেবে না। আর এই যেখানে খুশি যখন খুশি ঘুরে বেড়ানোর ব্যাপারটি কিন্তু অনেকটা Symbolic।

লেখক দীর্ঘদিন বিদেশে লেখাপড়া করছেন বলে দেশের অনেক অবস্থার কথা জানেন না। অথবা এ তাঁর জানার স্বল্পতা। তিনি লিখেছেন — 'পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বিভাগের লোকেরা যদি নিরাপত্তা দিতে পারে তাহলে দেখা যাবে একজন দুজন না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত মেয়ে চাঁদনি রাতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বা রমনা পার্কে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' শেখ মিজানের জ্ঞাতার্থে বলছি সন্ধ্যা সাতটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসের গেট বন্ধ হয়ে যায়, ইচ্ছে করলেই তারা চাঁদনি রাতের সৌন্দর্য সোহরাওয়ার্দী বা রমনায় হেঁটে উপভোগ করতে পারবে না। উপভোগ করতে হলে ঘুণধরা নিয়মের মত মেয়েদের হল বন্ধ হবার নিয়ম তুলে দিতে হবে। এক নিয়মের সঙ্গে জড়িয়ে আরও শত নিয়ম থাকে। একটি একটি করে সবই তুলে ফেলতে হবে গোড়া থেকে। এমন তুলতে তুলতেই একদিন নারীর উঠান থেকে 'নিয়মের' সব পাপ দূর হবে।

৫.

গোটা সমাজ নারীকে চরম অপমান করছে। ইসলাম ধর্ম নারীকে পুরুষের দাসী বানিয়েছে। আমাদের সমাজ বা রাষ্ট্র এই ধর্মের বিপরীত কোনও কথা বলে না। অধিকাংশ পুরুষই চায় নারী ভোগের বস্তু, একে সাজিয়ে গুজিয়ে কিছুটা লেখাপড়া শিখিয়ে পুরুষের মনোরঞ্জন করবার জন্য চমৎকার 'মাল' বানাতে হবে, দেখতে চমৎকার হলে পুরুষ তাকে করুণা করবে, পুরুষের অনুগ্রহেই নারী জীবনের সার্থকতা। নারীর এই চরম দুরবস্থা দূর করবার জন্য চরমপন্থী হওয়াই উচিত। একজন তোমাকে আঘাত করবে শরীরে, তাকে পাল্টা আঘাত না করে দিনদিন করে কাঁদলে লোকে ভাল বলবে হয়ত, বলবে এ মেয়ে চরমপন্থী না, এ মেয়ে মেয়েমানুষের মত লক্ষ্মী হয়ে বসে চোখের জল ফেলছে—এমন স্তুতি আমার কোনও কাজের না। নারীকে আরও দুর্বল আরও অসহায় অক্ষম অথর্ব করে রাখবার পাঁয়তারা এসব। চরমপন্থীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে চরমপন্থী হতে হয়।

১.

বছর শেষের 'যায় যায় দিনে' সারাবছরে বাংলাদেশ থেকে কী কী জিনিস ভারতে আমদানি রফতানি হল, তার একটি হিসেব ছাপা হয়েছে। ওতে লেখা, ভারতে অবৈধভাবে যাচ্ছে তসলিমার লজ্জা। কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যে। লজ্জা কখনও এদেশ থেকে অবৈধভাবে যায়নি। এদেশে সরকার দ্বারা বইটি বাজেয়াপ্ত হওয়ার আগে বইটি ভারতে রফতানি হয়েছে, এবং বৈধভাবে। লজ্জা এদেশে বাজেয়াপ্তর পর যখন আর যাচ্ছিল না ভারতে, ভারতের কিছু অসৎ ব্যবসায়ি তখন বইটি অবৈধভাবে ভারতে ছাপায়, এবং হাটে মাঠে ঘাটে দেদার বিক্রি করে। পরে অবশ্য আনন্দ পাবলিশার্স বইটি যখন বৈধভাবে ছাপাবার অনুমতি পায়, বেশ কটি অসৎ ব্যবসায়িকে তারা বই নকলের অভিযোগে জেলেও পোরে।

সরকার তো বইটির ওপর ক্ষিপ্ত কম ছিলেন না। কিন্তু অবাক হয়ে আমাকে শুনতে হয়, এখানেও বইয়ের দোকানে, বিজ্ঞান মেলায়, রাস্তা ঘাটে, সংবাদপত্র স্টলে, ফুলের দোকানে লজ্জা বিক্রি হচ্ছে। কভার ছাড়া আশি টাকা, কভার নিয়ে একশ টাকা। বাজেয়াপ্ত করে সরকারের কি লাভ হয়েছে জানি না, পাঠকের ক্ষতি হয়েছে ষাট টাকা। যে বইটি তারা চল্লিশ টাকায় কিনতে পেত, ষাট টাকা বেশি দিয়ে সেটি এখন একশ টাকায় কিনতে হচ্ছে।

অনেকে বলে, বিজেপি নাকি বই ছাপছে ভারতে। বিজেপি অংশবিশেষ অনুবাদ করছে এটা ঠিক, তাদের কিন্তু পুরো বই অনুবাদ করবার সাহস বা স্পর্ধা কোনওটিই নেই। কারণ বইটিতে বিজেপির বিরুদ্ধে যথেষ্ট কথাবার্তা আছে। পুরো বই অনেকে ছেপেছেন, তাঁরা বিজেপির নয়, বরং বিজেপির ঘোর বিরোধি লোক তাঁরা। তাঁরা আপাদমস্তক সেক্যুলার। যাঁরা বই ছাপছেন, বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করছেন, বইটি নিয়ে যাত্রা নাটক ফিল্ম করছেন, তাঁরা সকলে হিন্দু একথা ঠিক নয়; আবদুর রশীদ, কামাল উদ্দিন নামের লোকেরাও সঙ্গে আছেন। আসলে একটি অসাম্প্রদায়িক রচনাকে সাম্প্রদায়িক বানানোর যে চেষ্টা চলছে এখানে, তা যেমন হাস্যকর, তেমন বিরক্তিকরও বটে। এটি যে ভারতের অসাম্প্রদায়িক লেখকদের প্রেরণা দিচ্ছে সংখ্যালঘু মুসলমানদের পক্ষে আরও লজ্জা লিখবার, দেবেশ রায় ইতিমধ্যে মুসলমানদের পক্ষে লিখেওছেন একটি উপন্যাস, সেটি কি এখানকার মুসলমানদের চোখে পড়ে না? নাকি চোখে পড়লেও সত্যকে আড়াল করবার প্রবণতা এত বেশি যে ও ব্যাপারে তারা মোটেই মুখ খুলতে চান না! লজ্জা লিখে, আমাকে অনেকেই বলেছে, আমি হিন্দুদের উপকার যত করছি, তার চেয়ে বেশি করেছি মুসলমানদের উপকার। মুসলমান কত মানবিক হতে পারে, কত অসাম্প্রদায়িক হতে পারে তার একটি নমুনা হয়ে রইল লজ্জা। সংখ্যাগুরুর লোক হয়ে সংখ্যালঘুর পক্ষে লিখেছে, এমন উদারতা আর কোনও সম্প্রদায়ে দেখা যায় না। মুসলমানরা এটি তাদের সুযোগ সুবিধে মত কাজে লাগাতে পারে। আমাকে দুচার জন এও বলেছে যে লজ্জা লিখে আমি বাংলাদেশের হিন্দুদের কিছুটা অপকারও করেছি, তাদের মনে তীব্র যে আগুন জ্বলছিল, সেটিকে নিভিয়ে দিয়েছি, যে ক্ষোভ তাদের জমা ছিল বুকে, যে

ক্ষোভের কারণে তারা ভয়ংকর কিছু করতে পারত, সেটিকে কমিয়ে দিয়েছি, তারা এখন ভাবতে পারছে তাদের পক্ষ হয়ে লড়বার মানুষ আছে, তারা একা নয়, দুর্বলের পাশে সবলের পক্ষ থেকে কেউ দাঁড়ালে দুর্বল কিছু দমে আসে। তারা যে আগুন লাগাতে চায়, সে আগুন তারা আর লাগায় না। উদারতার এই এক বড় সাফল্য।

২.

যায় যায় দিন ভারতে রফতানি সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য রফতানির কথা বাদ দিয়ে গেছে, সেটি হল বই। বাংলাদেশ থেকে কখনও কোনও বই এত বই এত বিপুল পরিমাণে ভারতে রফতানি হয়নি, দুবছর থেকে তসলিমা নাসরিনের বই যে ভাবে রফতানি হচ্ছে। এতে পুস্তক-প্রকাশক, রফতানিকারক সকলেই লাভবান হচ্ছে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে এই দেশ, এটি কি দেশের জন্য বড় এক সাফল্য নয়? তার ওপর তসলিমার বই ভারতে জনপ্রিয় হওয়ায় বাংলাদেশের লেখকদের সম্পর্কে ভারতের পাঠকদের যে অনীহা ছিল তা দূর হচ্ছে, এবং তারা এই প্রথম আগ্রহ দেখাচ্ছে এখানকার লেখকদের বই সম্পর্কে। ধীরে ধীরে অন্য লেখকদেরও বই ভারতে যাবে, ইতিমধ্যে দুএকজন লেখক ভারতে বইয়ের বাজার পাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে পড়েছেন। তসলিমার বইয়ের সঙ্গে তাঁদের বই রফতানি করবার জন্য রফতানিকারকদের তাগাদা দিচ্ছেন। আমি আশা করছি, হবে, ধীরে ধীরে, এভাবেই অন্যান্য লেখকের পাঠক সৃষ্টি হবে ভারতে। একা তসলিমার পক্ষে এত বই লেখা সম্ভব নয় যত ওখানে এখন পাঠক চাহিদা। এতে অবশ্য তসলিমারও কিছুটা উপকার হবে, লেখকদের ঈর্ষা বাণে তাকে এত বিদ্ধ হতে হবে না।

৩.

শুক্রবার ঢাকার মসজিদগুলোয় আজকাল প্রার্থনাকারিরা উপচে পড়ে। রাস্তা অবধি নেমে আসে পিপিলিকার মত মানুষ। এর ফলে রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে নামাজ পড়তে হয়। আজকাল রাস্তা বন্ধ করে রাজনৈতিক সভা বা ইসলামি জলসা করা একরকম নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে, এতে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ যে কত হয় তা সাধারণ মানুষই জানে; অসাধারণ রাজনীতিবিদ এবং ইসলাম প্রচারকদের তা জানবার কথা নয়। আমি মনে করি রাস্তা বন্ধ না করে খোলা কোনও মাঠে এই সভাগুলো হওয়া উচিত। ট্রাফিক জ্যামে যারা পড়ে, তারা জরুরি যে কাজে বেরোয়, তা একেবারেই ভেস্তে যায়। এর ফলে রাস্তা বন্ধকারিদের প্রতি গালাগাল বর্ষণ ছাড়া তাদের আর কোনও উপায় থাকে না। মানুষের কল্যাণের জন্যই যদি সভার আয়োজন, তবে মানুষের কাজের ক্ষতি করবার কোনও অধিকার কি তাদের আছে? যে রোগীটি সময়মত হাসপাতালে যেতে না পেরে রাস্তায় মারা যাচ্ছে, তার মৃত্যুর দায় কি তারা নেবে?

এই বিজ্ঞানের যুগে মানুষ যখন উপচে পড়ছে মসজিদে, আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরাই আজকাল যখন মসজিদে যান, তখন মসজিদ ভেঙে ফেল স্লোগান দিলে আমার কল্লাটিই কেবল ডাল্লা হবে, মসজিদ কেউই ভাঙবে না—, এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে আমি মসজিদগুলোকে প্রস্থে না বাড়িয়ে দৈর্ঘে বাড়াতে বলছি। অর্থাৎ দোতলা তিনতলা

মাত্র চারতলা মসজিদ করুন, তবু রাস্তা বন্ধ করবেন না। কারণ যাদের অলৌকিকের চেয়ে জীবনের প্রয়োজন বেশি, যাদের খেটে খেতে হয়, রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিলে তাদের উপার্জন সম্ভব নয়। এবং আরও একটি প্রস্তাব আমার আছে, সেটি হল, একটি পাড়ায় একাধিক মসজিদ আছে, আর নয়; অন্তত একটি খেলার মাঠ, একটি লাইব্রেরি, একটি বিজ্ঞান ক্লাব, একটি স্কুল করবার জায়গা দিন, মসজিদে যদি স্থান সংকুলান না হয়, তবে তলা বাড়ান, কিন্তু জায়গা রাখুন খেলার মাঠ, স্কুল, লাইব্রেরি এবং বিজ্ঞান ক্লাবের জন্য। এতে সমাজের মঙ্গল হবে, অমঙ্গল নয়।

যায় যায় দিন, ঢাকা

Sentenced to Death

Yesterday, at a rally at the National Mosque here in the capital of Bangladesh. A crowd of 10,000 Muslim fundamentalists called for my death.The group that initiated the fatwa or death sentence, the Council of Soldiers of Islam, has been joined by other fundamentalist groups demanding that the Government ban my books and put "blasphemers" like me to death.

My most recent book, "Lajja" ("Shame") was about a Hindu family persecuted in Bangladesh after the destruction of the Ayodhya Mosque in India in December 1992. In India, fundamentalist Hindu killed innocent Muslims; in Pakistan and Bangladesh, Fundamentalist Muslims persecuted Hindus and burned their temples. This summer, after 50,000 copies of the novel had been sold the Government banned it under pressure from the fudamentalists, saying it was "creating misunderstanding between communities."

But I will not be silenced. Everywhere I look I see women being mistreated, and their oppression justified in the name of religion. Is it not my moral responsibility to protest? Some men would keep women in chains— veiled, illiterate and in the kitchen. There are 60 million women in my country; not more than 15 percent of them can read and write. How can Bangladesh become a modern country and find its place in the world when it is dragged backward by reactionary attitudes toward half its people?

It is my conviction that politics can not be based on religion if our women are to be free. Bangladesh must become a modern secular state, family laws based on Islamic principles should be replaced by a uniform code insuring the equal rights of women.

The country has laws against religious courts and their fatwas. But They are ignored. This year in the village of Chatakchara, a young woman was stoned to death on orders from a local court because she had married again after a divorce. In Kalikapur village mullans accused another young woman of fornication and sentenced her to a public flogging with 101 lashes of a broom. She

died soon after, allegedly a suicide. There are other such cases, girls from poor families in isolated areas, illegally sentenced by extremist interpreters of Islamic law.

For speaking out against such crimes, I too have been coundemned to death. Why does the Government not prosecute the fanatics who institute these fatwas? Many believe it is because the admintatration has come to power with the help of fundamentalists.

The authorities confiscated my passport in January; when I tried to get it back, they said I couldn't have it bacause I write against religion.In September. When the newspapers reported that fundamentalists had put a price on my head. I had to go to court and sue to get police protection. (The reward, about $1,200 has apparently been rescinded but the fatwas still stands)

Is our Prime Minister, Khaleda Zia, afraid to stand up to the fundamentalists? Does she not see that by placating them she allows them to grow stronger, and the time will come when they turn upon her too?

Bangladesh is my motherland. We gained our independence from Pakistan at the sacrifice of 3 million lives. That sacrifice will be betrayed if we allow ourselves to be dominated by religious extremism. Bangladesh should stand for women's equality and harmony between people of different faiths.

The mullahs who would murder me will kill everything progressive in Bangladesh if they are allowed to prevail. It is my duty to try to protect my beautiful country from them. I call on all those who share my values to help me defend my rights. By doing so, they will help save Bangladesh.

OP-ED
THE NEW YORK TIMES, USA

রচনাকাল
এপ্রিল ৯৩-জানুয়ারি ৯৪